সাঈদ ইবনে আলি আল কাহতানি

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

তাওহীদ দুর্বল ও

ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ

চতুর্থ অধ্যায়

মুশরিকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত, পথ ও পদ্ধতি

সম্পাদকের কথা

হামদ ও সালাতের পর—

তাওহীদ আরবি শব্দ। সহজ বাংলা অর্থ একত্ববাদ। এর মর্ম হচ্ছে আল্লাহকে সত্তা ও গুণগত দিক থেকে একক জেনে ও মেনে তার ইবাদত করা। একজন মুসলমানের জন্য তাওহীদের গুরুত্ব অপরিসীম। বহুল তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বিশুদ্ধ তাওহীদ ব্যতীত কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রাণ যেমন, তেমনই মুমিন ও মুসলমান থাকার জন্য তাওহীদ। ইহ ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তির একমাত্র সোপান হচ্ছে তাওহীদ। আল্লাহ কুরআনে এরই ঘোষণা দিয়ে বলেছেন—

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ.

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে শিরকের সঙ্গে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।[১]

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

জেনে রাখো, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে এবং তাকে ভয়

---

১ সুরা আনআম, ৮২।

করে, তাদের জন্য পৃথিবীর জীবনে ও পরকালে রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহর কথায় কোনো নড়বড় হবে না। এটিই বড় সাফল্য।[২]

হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি শিরকের ওপর মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা ব্যতীত (তাওহীদের ওপর) মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসের আলোকে বোঝা গেল উভয় জগতে তাওহীদ কতটা তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যক্তির চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করছে তাওহীদের বিশ্বাসের ওপর। কোনো বিষয় যত মূল্যবান হয় তার হিফাজত ও সংরক্ষণ ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। পৃথিবীতে ঈমান ও তাওহীদের চেয়ে মূল্যবান কোনো বস্তু নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ তাওহীদের প্রতি আমাদের ভ্রুপেক্ষ যেন অতিই সামান্য। অধিকাংশ মানুষের এ ব্যাপারে কোনো অনুভূতিই নেই। দুনিয়া উপার্জনের পেছনে তারা এতটা মত্ত ও অন্ধ হয়ে পড়েছে যে, বেমালুম ভুলে গেছে পরকাল। ভুলে গেছে ঈমান-আকিদার কথা। সে যে একজন মুসলিম এই অনুভবটুকু হৃদয়ে জাগরুক নেই। সত্যিই এর চেয়ে দুঃখজনক বিষয় আর হতে পারে না। সকাল নয়টায় অফিসে যেতে হবে এ কথা খুব মনে থাকে, ঘুম থেকে জাগ্রত হতে সামান্য দেরি হলে চিন্তা-পেরেশানির অন্ত থাকে না, বসের গালি খেতে হবে বলে। কিন্তু ফজরের নামাজের ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। দিনের পর দিন শুধু নয়, মাসের পর মাস ফজরের সালাতের জন্য জাগ্রত হতে না পারলেও অন্তরে সামান্য অনুশোচনা হয় না। অথচ আল্লাহর রাসুল নামাজকে ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী বলেছেন। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। উদাসীনতার পারদ কতটা ওপরে উঠেছে এর একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র।

---

২ সুরা ইউনুস, ৬২-৬৪।
৩ সহিহ বুখারি, ১২৩৮।

বর্তমান সময়ে যে-কয়টি বিষয়ের আলোচনা অধিক পরিমাণে হওয়া দরকার তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে ঈমান ও তাওহীদের আলোচনা, ঈমান ভঙ্গের আলোচনা। প্রতিটি মসজিদের মিম্বর এবং প্রতিটি মাহফিলের স্টেজ থেকে সর্বাগ্রে এ বিষয় আলোচনার দাবি রাখে। অধুনা আমাদের চারদিকে এমন মানুষের সংখ্যা বিরাট যারা নিয়মিত নামাজ-রোজা করছে, হজ করছে বছর বছর, কিন্তু প্রতিনিয়ত এমন কিছু করছে, এমন কিছু অবলীলায় বলছে যা তার ঈমানকে শঙ্কায় ফেলে দিচ্ছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদিসে উম্মতকে এই বলে সতর্ক করেছেন যে, সকালে মুমিন থাকবে সন্ধ্যায় ঈমান হারিয়ে ফেলবে, সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে সকালে ঈমান হারিয়ে ফেলবে। আল্লাহ না করুন, আমরা যেন সেই জামানার সম্মুখীন হতে যাচ্ছি দ্রুতই। চারদিকে ফিতনা, ফিতনা আর ফিতনা। বিশুদ্ধ ঈমান-আকিদার ওপর অবিচল থাকা যেন হাতে আগুন রাখার মতো কঠিন হয়ে গেছে।

নবিজির ওয়ারিশ আলিম ও দায়িদের এখন করণীয় হচ্ছে উম্মতকে ফিতনার করাল গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রাখা। তাদের ঈমান-আকিদার হিফাজত করা। কুফর ও ইরতিদাদের ভয়াল থাবা থেকে আগলে রাখা, মা-মুরগি যেমন তার ছানাদের উড়ন্ত বাজ থেকে আগলে রাখে।

তাওহীদের পাঠশালা শীর্ষক গ্রন্থটি আরবের বিশিষ্ট আলিম ও সাড়া জাগানো লেখক ডক্টর সাইদ ইবনে আলি আল-কাহতানি রচিত *আল-উরওয়াতুল উসকা* গ্রন্থের অনুবাদ। বাংলাভাষী পাঠকদের কথা ভেবে বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা এ সহজ নামটি চয়ন করেছি। পুরো গ্রন্থে কুরআন ও হাদিসের আলোকে ঈমানের পরিচয়, ঈমানের মাহাত্ম্য, ঈমানে দাবি, ঈমানের শর্ত, ঈমানের রুকন, ঈমান দুর্বল ও ভঙ্গের কারণ নাতিদীর্ঘ পরিসরে লেখক আলোচনা করেছেন। দীর্ঘ কলেবর নয় যে পাঠক বিরক্ত হবেন, আবার অতি সংক্ষিপ্ত নয় যে বোধগম্য হবে না।

গ্রন্থটি আরবি থেকে অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক রাশিদুল আলম। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। দুনিয়ায় সম্মান ও আখিরাতে নাজাতের উপকরণ বানান। সম্পাদনার কাজটি আঞ্জাম দিয়েছি আমি। যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি গ্রন্থটির আলোচনা ও ভাষা পাঠকের বোধগম্য করে তুলতে। আকিদাবিষয়ক গ্রন্থ এমনিতে কঠিন হয়ে থাকে কিছুটা। সঙ্গে পরিভাষাগত জটিলতা। আন্তরিক চেষ্টা করেছি প্রতিটি বিষয় যেন পাঠক সহজে বুঝতে পারেন। বর্ণিত দুআসমূহের আরবির পাশাপাশি বাংলা উচ্চারণও লিখে

দিয়েছি, সকল পাঠক যেন উপকৃত হতে পারেন। কুরআনের আয়াত ও হাদিসের তথ্য যথাযথ সংযোজন করেছি। সর্বোপরি গ্রন্থটি আপনার ঈমানকে শানিত করবে সেই প্রত্যাশা করি।

বইটি প্রকাশ করেছে হাসানাহ পাবলিকেশন। লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক সকলকে আল্লাহ কবুল করুন। নাম জানা না-জানা আরও যাদের আন্তরিক শ্রম লেগে আছে, সকলকে মহামহিম উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। দুনিয়া-আখিরাতে সম্মানিত করুন। আমিন!

মুফতি জুবায়ের রশীদ

লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি মহান আল্লাহর। আপতিত দুঃখ-কষ্টে, আক্রান্ত বিপদ-মুসিবতে আমরা তার কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করি। আমাদের হৃদয়-মনের সমস্ত মন্দত্ব, অনিষ্টতা এবং কর্মের সকল ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি থেকে বিদগ্ধচিত্তে তার কাছেই ক্ষমাপ্রার্থনা করি। বিশ্বাস করি, তিনি যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করতে পারে না। আর তিনি যাকে ভ্রষ্টতার ভাগাড়ে ঠেলে দেন, কেউ তাকে আলোর পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি তার বান্দা ও রাসুল। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার ও তার পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের ওপর।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাওহীদবিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। এটি মূলত প্রথমে আমার নিজের জন্য লিখেছি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যাদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর মনে করেন তাদের জন্য। অনুগত ও বিনয়াবনত অন্তরে দুআ করি, আল্লাহ আমাকে, আপনাদেরকে, তাদেরকে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে তার সাদিক ও মুখলিস বান্দা হিসেবে কবুল করে নিন। তার নির্দেশিত পথে চলার, যা করলে তিনি খুশি হবেন তা করার এবং যা করলে অসন্তুষ্ট হবেন তা বর্জনের তাওফিক দান করুন।

গ্রন্থটি আমি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি—

প্রথম অধ্যায় : কালিমার প্রথমাংশ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর আলোচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : কালিমার দ্বিতীয়াংশ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ-এর আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায় : তাওহীদের ত্রুটি ও ভঙ্গের কারণ।

চতুর্থ অধ্যায় : মুশরিকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত, পথ ও পদ্ধতি।

প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে বিভিন্ন শিরোনামে সংশ্লিষ্ট আলোচনা করেছি।

গ্রন্থটিতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের আকিদা, পথ ও পদ্ধতির অনুসরণ করেছি। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, গ্রন্থটিকে তিনি যেন একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করে নেন। লেখক, পাঠক, প্রকাশক, প্রচারক সকলের জান্নাত লাভের মাধ্যম বানান। আমার জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর এই গ্রন্থ যেন আমাকে অনবরত ও অনিঃশেষ উপকৃত করতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ উত্তম বিনিময়দাতা। সকল ক্ষেত্রে তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কর্মবিধায়ক।

সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের ওপর।

সাইদ ইবনে আলি আল-কাহতানি

শনিবার ১৭/১০/১৪১৫ হিজরি

প্রথম অধ্যায়

কালিমার প্রথমাংশ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর আলোচনা

প্রথম আলোচনা

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য :

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এমন এক মহামূল্যবান কালিমা, যার কারণে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে সকল মাখলুক। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

> জিন ও মানবজাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।[৪]

সুতরাং বোঝা গেল, এই পৃথিবী, এই আসমান জমিন সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবুয়ত ও রিসালাতের মহান বার্তা দিয়ে নবী- রাসুলদের প্রেরণ করেছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং প্রণয়ন করেছেন ইসলামি শরিয়া। কী চমৎকার ব্যঞ্জনায় এই কথা বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

> আপনার পূর্বে প্রেরিত প্রত্যেক রাসুলকে আমি এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।[৫]

আর এজন্যই বান্দার আমল লিপিবদ্ধ করা হয়। কিয়ামতের দিন তা পরিমাপ করা হবে। অতঃপর পরিণামস্বরূপ তাদের জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের ফয়সালা করবেন। কালিমার ভিত্তিতেই মানুষ মুমিন ও কাফির, নেককার ও বদকার, হতভাগ্য ও সৌভাগ্যবান দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হবে। মানুষকে সওয়াব

---

৪ সুরা যারিয়াত, ৫৬।
৫ সুরা আম্বিয়া, ২৫।

অথবা শাস্তি দেওয়া হবে। মানুষের আমলনামা হয়তো ডান হাতে দেওয়া হবে, নয়তো বাম হতে। কারও আমলনামা হালকা হবে, আবার কারওটা হবে ভারী। কালিমার মাধ্যমেই মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে চিরকালের জন্য, নয়তো চিরকালের জন্য জাহান্নামে ঠিকানা হবে।

এটি এমন এক মহা ও ধ্রুব সত্য, যার ফলে সমগ্র মাখলুককে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই কালিমা সম্পর্কে এবং কালিমার হক সম্পর্কে কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে প্রশ্ন করা হবে। এর ওপর ভিত্তি করে মানুষকে সওয়াব অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে। এরই জন্য কিবলা এবং মিল্লাতুন ওয়াহিদা বা এক জাতিরূপে গঠন করা হয়েছে। এই কালিমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সকল বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার হক। যেমন হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার হক হলো, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছু শরিক না করে একমাত্র তারই ইবাদত করবে।'[৬]

মুমিন বান্দাদের ওপর আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় নিয়ামত ও অনুগ্রহ হলো, আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত ও সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন এবং এই কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মাধ্যমে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো ইসলামের কালিমা। এটি জান্নাতের চাবি। এর মাধ্যমেই বান্দার জান ও মাল নিরাপত্তা লাভ করে। এটি সেই মহাবাণী যার কারণে জিহাদের তরবারি কোষমুক্ত হয়। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أُمِرْتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذا فَعَلوا ذلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهم إِلاَّ بحَقِّ الإسلامِ، وحِسابُهُمْ عَلى اللَّهِ.

আমি মানুষের সঙ্গে জিহাদ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ—এই কালিমার সাক্ষ্য দেয়, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত প্রদান করে। তারা যখন এগুলো করবে তখন তারা আমার থেকে তাদের জান ও মালকে

---

৬ ফাতহুল বারি, ১৩/৩৪৭; সহিহ মুসলিম, ৩০।

নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের হক ব্যতীত। তাদের হিসেব আল্লাহ তাআলার নিকট।[৭]

মানুষকে প্রথমে কালিমার দাওয়াত দিতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআজ ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় বলে দেন এই কথা—

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ.

নিশ্চয় তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। গিয়ে তুমি প্রথমে তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানাবে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুল বলেছেন, 'তুমি প্রথম তাদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ—এই কালিমার সাক্ষ্য প্রদানে আহ্বান করবে।'[৮]

এই কালিমা হচ্ছে, ইসলাম নামক বৃক্ষের মূল শেকড় বা ইসলাম নামক তাঁবুর খুঁটি ও স্তম্ভ। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি জিনিসের ওপর। এক. এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল, দুই. নামাজ কায়েম করা, তিন. জাকাত প্রদান করা, চার. হজ করা, পাঁচ. রমজানের রোজা রাখা।[৯]

এটিই হলো আল-উরওয়াতুল উসকা তথা দ্বীনের শক্ত বাঁধন, মজবুত হাতল। এটি হকের কালিমা, ইসলামের কালিমা, ঈমানের কালিমা, তাকওয়ার কালিমা। এই কালিমা সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী। মানুষের বলা কথাসমূহের মধ্যে উত্তম কথা। এটিই নেক ও সৎকাজের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এটি হকের শাহাদাহ ও সাক্ষ্য, হকের দাওয়াত এবং সর্বোত্তম জিকির। নবী-রাসুলগণ যুগে যুগে এই

---

৭ সহিহ বুখারি ও মুসলিম।

৮ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৩/৩২২।

৯ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১/৪৯।

কালিমারই দাওয়াত দিয়েছেন। তারা পৃথিবীতে প্রেরিত হয়ে যত কথা বলেছেন, তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা হলো এই কালিমা। এই কালিমার মাধ্যমেই জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে। এটি এমন মহান কালিমা, কিয়ামতের দিন বান্দাকে এর সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হবে। দুটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত মানুষ তাদের পা নিজ স্থান থেকে সামান্য নড়াতে পারবে না। প্রশ্ন দুটি হচ্ছে, এক. দুনিয়ায় তুমি কার ইবাদত করতে? দুই. তুমি কি তোমার রাসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছিলে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো, কালিমার প্রথমাংশ, তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো, কালিমার দ্বিতীয়াংশ, তথা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। অর্থাৎ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চেনা, তার নবুয়তের স্বীকারোক্তি, তার আনীত বিধিবিধান মেনে নেওয়া এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কারণ, তিনি হলেন আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল। তিনি হলেন ওহির সংরক্ষক, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি প্রেরিত রাসুল। সত্য ও সঠিক ধর্ম নিয়ে প্রেরিত মহামানব। আল্লাহ তাআলা তাকে মানবজাতির জন্য রহমত, মুত্তাকিদের জন্য ইমাম এবং সকল সৃষ্টির জন্য প্রমাণস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মানুষকে সরল, সঠিক এবং আলোকিত পথ দেখিয়েছেন। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত অনেক অন্ধের চক্ষু খুলে দিয়েছেন, দ্বীনের উপলব্ধি থেকে বদ্ধ হৃদয়ের দুয়ার উন্মুক্ত করেছেন এবং অনেকের কানের বধিরতা দূর করেছেন। রাসুলকে অনুসরণ করা, তার মুহাব্বত হৃদয়ে পোষণ করা, তাকে যথাযথ সম্মান করা, সাহায্য করা এবং তার সকল হক আদায় করা মানুষের ওপর ফরজ করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ অনুসরণ করা ব্যতীত জান্নাতে যাওয়ার আর কোনো পথ নেই। আল্লাহ তাআলা তার বক্ষকে প্রশস্ত করেছেন, তার মর্যাদা ও সম্মান উঁচু করেছেন, তার সকল ভার হালকা করেছেন এবং তার বিরোধীদের জন্য ঘোর লাঞ্ছনা ও অপমান নির্ধারণ করে রেখেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির সফলতা ও মুক্তির পথ। যে যত বেশি তার অনুসরণ করবে সে তত সফল হবে, জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতাকে ঝুলিয়ে রেখেছেন রাসুলের অনুসরণের ওপর। যারা তার অনুসরণ করবে না, উভয় জগতে তারা ব্যর্থ ও দুর্ভাগা হবে। কেবল তার অনুসরণকারীদের জন্য রয়েছে হিদায়াত, নিরাপত্তা, সম্মান, সফলতা, সাহায্য ও বিজয়। আল্লাহ ও তার রাসুল হবেন তাদের পরম বন্ধু, অভিভাবক।

সেইসঙ্গে তারা দুনিয়া-আখিরাতে সফল হবে, উত্তম জীবনযাপন করবে। পক্ষান্তরে তার অবাধ্য ও বিরোধিতাকারীদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা, অপমান, ভয়, ভ্রষ্টতা, দুর্ভাগ্য আর চরম বিপর্যয় ও চূড়ান্ত ক্ষতি।[১০]

দ্বিতীয় আলোচনা:
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্ম :

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্ম হচ্ছে, এই কথা বিশ্বাস ও স্বীকার করা যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। বিশাল সৃষ্টিজগতে তার কোনো অংশীদার নেই। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফিরিশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১১]

---

১০ যাদুল মাআদ, ১/৩৪-৩৬, আশ-শিফা ফি হুকুকিল মুসতফা, ১/৩।
১১ সুরা আলে ইমরান, ১৮।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

আপনার পূর্বে প্রেরিত প্রত্যেক রাসুলকে আমি এই আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।[১২]

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.

এটা এ কারণে যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য; আর তার পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য। আল্লাহই সকলের উচ্চে, তিনি মহান।[১৩]

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ.

তারা কি মাটির তৈরি উপাস্য গ্রহণ করেছে যে, তারা তাদেরকে জীবিত করবে? যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব, তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।[১৪]

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

নিশ্চয় তারা কাফির যারা বলে আল্লাহ তিনের এক, অথচ এক উপাস্য ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।[১৫]

---

১২ সুরা আম্বিয়া, ২৫।
১৩ সুরা হজ, ৬২।
১৪ সুরা আম্বিয়া, ২১-২২।
১৫ সুরা মায়িদা, ৭৩।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, একটি বিষয়ের দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা হচ্ছে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। যদি তারা এই কথা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও, সাক্ষী থাকো, আমরা (আমাদের রবের) অনুগত।[১৬]

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

জিজ্ঞেস করুন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা কে? বলুন, তিনি আল্লাহ। বলুন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা নিজেদের ভালো-মন্দেরও মালিক নয়? বলুন, অন্ধ-চক্ষুষ্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলো সমান হয়। তবে কি তারা আল্লাহর জন্য এমন অংশীদার স্থির করেছে যারা আল্লাহর ন্যায় সৃষ্টি করেছে? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলুন, আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী।[১৭]

---

১৬ সুরা আলে ইমরান, ৬৪।
১৭ সুরা রাদ, ১৬।

উল্লিখিত আয়াত ব্যতীত কুরআনে আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, প্রকৃত ও সত্য উপাস্য একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনিই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা। ইলাহ শব্দের অর্থ হলো, মাবুদ, উপাস্য। এ কারণেই হুদ আ.-এর সম্প্রদায় তাকে বলেছিল—

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এইজন্য এসেছ যে, আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করব এবং আমাদের বাপদাদা যাদের পূজা করত, তাদেরকে ছেড়ে দেবো? ঠিক আছে, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে নিয়ে এসো যা দিয়ে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ।[১৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরাইশ সম্প্রদায়ের কাফিরদের বললেন, তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, তাহলে তোমরা সফল হবে। জবাবে তারা বলল, (কুরআনের ভাষায়)—

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ.

সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে? তাহলে নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।[১৯]

কারণ, কুরাইশ সম্প্রদায় মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত ছিল। তারা প্রতিমার পূজা করত, তারা পূর্ববর্তী মৃত ব্যক্তিবর্গ, গাছপালা, কবরসহ ইত্যাকার আরও অনেককিছুর পূজা করত। তারা তাদের নামে পশু জবাই করত, মান্নত করত, নিজেদের প্রয়োজন তাদের কাছে চাইত, তাদের নিকট আপতিত বিপদ থেকে মুক্তিকামনা করত। এক কথায় তারা তাদের পূজা করত এবং তাদেরকে ইলাহ

---

১৮ সুরা আরাফ, ৭০।
১৯ সুরা সাদ, ৫।

তথা উপাস্য মনে করত। আর এজন্য তারা কালিমায়ে তাওহীদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। কেননা, এই কালিমা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত তাদের সকল ইলাহকে বাতিল ও মিথ্যা বলে ঘোষণা করে। ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ.

> তাদেরকে যখন বলা হতো, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব?[২০]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ 'লা-ইলাহা' হচ্ছে নফি। এর মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য সকল ইলাহ মিথ্যা ও বাতিল। তাদের অনুসরণ করা বিরাট অন্যায় ও জুলুম। দ্বিতীয় অংশ 'ইল্লাল্লাহ' হচ্ছে ইসবাত। এর মর্ম হচ্ছে, ইলাহ বা উপাস্য একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সুতরাং সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা যাবে না।

আত্মিক ও বাহ্যিক সকলপ্রকার ইবাদত তাওহিদে উলুহিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত। তাই ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য করতে হবে। অন্তর থেকে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে এবং শরিকহীনভাবে একমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে। কেননা, একমাত্র ইলাহ ও মাবুদ আল্লাহ তাআলা। আত্মিকভাবে তার আনুগত্যের দাবি হলো, অন্তর থেকে তাকে ভালোবাসা, অন্তরের অন্তস্তল থেকে সম্মান করা, তার সকল আদেশ অন্তর থেকে মেনে নেওয়া, তাকে ভয় করা, তার সামনে নত হওয়া, তার সম্মুখে নিজেকে একেবারে জালিল তথা তুচ্ছ মনে করা এবং সকল কাজে ও সকল বিষয়ে অন্তর থেকে তার ওপর ভরসা করা। অনুরূপভাবে বাহ্যিক সকল ইবাদতও একমাত্র তার জন্যই করা। যেমন প্রার্থনা করা, সিজদা করা, মান্নত করা, নত হওয়া, রোজা রাখা, কুরবানি করা, বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা, সাহায্যপ্রার্থনা, আশ্রয় চাওয়া। মোটকথা, সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য করতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না। চাই সেটা কথার মাধ্যমে হোক,

---

২০ সুরা সাফফাত, ৩৫-৩৬।

অথবা কাজের মাধ্যমে। এমন কোনো কথা বলা যাবে না, যাতে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। কেবল এমন কথাই বলতে হবে, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। সর্বদা এমনসব কাজই করতে হবে, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি এমন কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করল যা একমাত্র আল্লাহ তাআলার হক, সে মুশরিক, যদিও সে মুখে মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। কারণ, সে মুখে কালিমা পড়লেও অন্তরে তা বিশ্বাস করে না এবং বাহ্যিকভাবে সে কালিমার দাবি অনুযায়ী আমল করে না। মুমিন তো সেই ব্যক্তি যে অন্তর ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকে আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করে, কেবল তারই ইবাদত করে।

তৃতীয় আলোচনা

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর রুকন :

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মাঝে দুটি রুকন বা অংশ রয়েছে। এক. লা-ইলাহা, যার অর্থ হচ্ছে কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই। দুই. ইল্লাল্লাহ। যার অর্থ, আল্লাহ ছাড়া।

এক. লা-ইলাহা (কোনো ইলাহ নেই) নফি। অর্থাৎ সারা বিশ্বের কোনোকিছুই প্রকৃত ইলাহ বা উপাস্য নয়। এখানে উলুহিয়্যাতকে সকল মাখলুক থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

দুই. ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া), এটি ইতিবাচক। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই হলেন প্রকৃত ইলাহ বা মাবুদ। এখানে উলুহিয়্যাতকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং প্রকৃত মাবুদ হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনি ছাড়া আর যতকিছুকে ইলাহ মনে করা হয়, সবগুলো বাতিল ও মিথ্যা। ইরশাদ হয়েছে—

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.

এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা আর যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ সর্বোচ্চ, মহান।[২১]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ :

'লা' হচ্ছে জিন্‌স, তথা জাতি বা সমষ্টিগত বিষয়কে নফি করার জন্য এসেছে। 'ইলাহ', এটি 'লা'-এর ইসম। আর এর খবর মাহজুফ, তথা উহ্য আছে। আর

---

২১ সুরা লুকমান, ৩০।

তা হলো 'হাক্কুন'। তখন কালিমার রূপ হবে এমন, لا إله حق إلا الله—'লা ইলাহা হাক্কুন ইল্লাল্লাহ'। যার অর্থ, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর যতকিছুর ইবাদত করা হয়, এই কালিমা তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তার সবগুলোকে অস্বীকার করে। সুতরাং ইবাদতের উপযুক্ত হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। এখানে কালিমার শুরুতে 'লা'-এর খবর 'হাক্কুন'। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা এটাই প্রমাণিত। 'হাক্কুন' ব্যতীত অন্যকিছু, যেমন 'মাওজুদুন' বা 'মাবুদুন'-কে 'লা'-এর খবর ধরা সঠিক নয়। এটা ভুল। কারণ, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অনেককিছুই আছে যাদের ইবাদত করা হয়, যেমন মূর্তি, গাছপালা, কবর ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর কিছুই প্রকৃত ইলাহ নয়। সুতরাং 'লা'-এর খবর 'হাক্কুন'। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি ব্যতীত আর যা-কিছুর ইবাদত করা হয়, সবকিছুই বাতিল বা মিথ্যা। আর এটিই হলো এই কালিমার দুই রুকন, তথা লা-ইলাহা (কোনো ইলাহ নেই) এবং ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া) এর দাবি।[২২]

---

২২ ফতোয়ায়ে ইবনে উসাইমিন, ৬/৬৬।

চতুর্থ আলোচনা

কালিমার ও মাহাত্ম্য :

কালিমার ফজিলত অনেক, যা এই গ্রন্থে বলে শেষ করা যাবে না। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে অন্তর থেকে এই কালিমা পড়বে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবান হবে। যে ব্যক্তি অন্তর থেকে না পড়ে, অন্তরে অবিশ্বাস রেখে এই কালিমা পড়বে, দুনিয়াতে যদিও তার জান ও মাল হারাম বা নিরাপত্তা লাভ করবে, কিন্তু আখিরাতে আল্লাহ তাআলার নিকট কঠিনভাবে ধৃত ও পাকড়াও হবে। হাদিসে এই কালিমার অসংখ্য ফজিলত ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। সে থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

এক. মুআজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, '(মৃত্যুর পূর্বে) যার শেষ কথা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৩]

দুই. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বার্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো যুদ্ধে গেলে ভোরে আক্রমণ পরিচালনা করতেন এবং আজান শ্রবণ করতেন। যদি আজান শোনা যেত, তাহলে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন আর না হয় আক্রমণ পরিচালনা করতেন। একবার তিনি শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি বলছে, আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! (আল্লাহ সবচেয়ে বড়! আল্লাহ সবচেয়ে বড়!) তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এটি মানুষের ফিতরাত তথা স্বভাবগত বিষয়।' অতঃপর লোকটি বলল, أشهد أن لا إله إلا الله–أشهد أن لا إله إلا الله (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

২৩ সুনানে আবু দাউদ, ৩/১৯০।

আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই)। এই কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে গেলে।'[২৪]

তিন. আবু জর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে অসিয়ত করুন।' তিনি বললেন, 'তুমি যদি কোনো গুনাহের কাজ করো, তাহলে তার পর পরই একটি নেকির কাজ করবে, তাহলে নেকি তোমার গুনাহকে মুছে দেবে।' তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা কি নেকির কাজ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এটিই তো সর্বোত্তম নেকির আমল।'[২৫]

চার. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নুহ আ. তার ছেলেকে মৃত্যুর সময় বললেন, 'আমি তোমাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার আদেশ করছি, নিশ্চয় সাত আসমান ও সাত জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আরেক পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালিমা ভারী হবে। আর যদি সাত আসমান ও সাত জমিন দুর্বোধ্য কোনো বৃত্ত হয়, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাকে ভেঙে চুরমার করে দেবে।'[২৬]

পাঁচ. আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসা আ. বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যার মাধ্যমে আমি আপনার জিকির করব, আপনাকে ডাকব।' আল্লাহ বললেন, 'হে মুসা, তুমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো।' তিনি বলেন, 'হে রব! আপনার সকল বান্দাই তো এটি বলে।' আল্লাহ বললেন, 'তুমিও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো।' তিনি বলেন, 'আমি এমন কিছু চাইছি, যার মাধ্যমে আপনি আমাকে আপনার বিশেষ নৈকট্য দান করবেন।' আল্লাহ বলেন, 'হে মুসা, নিশ্চয় সাত আসমান ও সাত জমিন যদি এক পাল্লায় আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আরেক পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালিমার পাল্লাই ভারী হবে।'[২৭]

---

২৪ সহিহ মুসলিম, ১/২৮৮।

২৫ মুসনাদে আহমদ, ৫/১৬৯।

২৬ মুসনাদে আহমদ, ২/১৭০ এবং ২২৫।

২৭ মুসতাদরাকে হাকেম, ১/৫২৮, ইমাম জাহাবি রহ. এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন; সহিহ ইবনে হিব্বান, ২৩২৪।

ছয়. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে এক দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন এক লোককে ডাকা হবে এবং তার সামনে নিরানব্বইটি খাতা খোলা হবে, যার প্রত্যেকটিই দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ। (সেগুলো হচ্ছে পাপ ও বদ আমলের খাতা) আর সেও তা স্বীকার করে নেবে। অতঃপর একটি কাঠ বের করা হবে যাতে, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু' লেখা থাকবে। এই সময় পাপের খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং কালিমা লেখা কাঠ রাখা হবে অন্য পাল্লায়। তখন পাপের খাতা রাখা পাল্লা ওপরের দিকে উঠে যাবে আর কালিমা লেখা কাঠের পাল্লা ভারী হয়ে নিচে ঝুঁকে যাবে।[২৮]

সাত. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বান্দা যদি খাঁটি মনে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে, তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং তাকে আরশের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবিরা গুনাহ পরিহার করে আসমানের দরজা তার জন্য খোলা থাকে।'[২৯]

আট. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সর্বোত্তম জিকির হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। আর সর্বোত্তম দুআ হলো আল-হামদুলিল্লাহ বলা।'[৩০]

নয়. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার অসুস্থতার সময় এই কালিমা পড়বে—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা-শারিকালাহু,

---

২৮ সুনানে তিরমিজি, ৫/২৪; মুসনাদে আহমদ, ২/২১৩; ইবনে হিব্বান, ২৫২৪। ইমাম জাহাবি ও ইবনে মাজাহ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

২৯ সুনানে তিরমিজি, ৩৮৪২।

৩০ সুনানে তিরমিজি, ৫/৪৬২, হাদিস ৩৩৮৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, ২/৪৯১২।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অতঃপর মারা যাবে, জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না।'[৩১]

দশ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সর্বোত্তম দুআ হলো আরাফা দিবসের দুআ। আমি এবং আমার পূর্বে প্রেরিত সকল নবীর সর্বোত্তম কালিমা হচ্ছে—

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

এগারো. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের সময় এই কালিমা পড়বে—

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই, সমস্ত রাজত্ব ও সকল প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য। তিনি জীবনদান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরজীবী, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না। তার হাতেই রয়েছে সমস্ত কল্যাণ। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।

তার জন্য আল্লাহ দশ লক্ষ নেকি বরাদ্দ করেন, দশ লক্ষ গুনাহ মাফ করেন এবং দশ লক্ষ গুণ সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।'[৩২]

বারো. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দৈনিক একশবার বলবে—

---

৩১ সুনানে তিরমিজি, ৩/১৫২; সুনানে ইবনে মাজাহ, ২/৩১৭।
৩২ সুনানে তিরমিজি, ৩৪২৮।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

তার দশজন দাস আজাদ করার সওয়াব হবে, তার জন্য একশ নেকি লেখা হবে এবং একশ গুনাহ মাফ করা হবে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে তাকে মুক্ত রাখা হবে। সেদিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ আসতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি আমল করেছে, কেবল সেই তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আসতে পারবে।'[৩৩]

তেরো. আবু আইয়ুব আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দশবার বলবে—

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

সে ইসমাইলি বংশের চারজন মানুষ আজাদ করার নেকি পাবে।'

চৌদ্দ. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে দশবার বলবে—

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

---

৩৩ সহিহ বুখারি, ৪/৯৫; সহিহ মুসলিম, ৪/২০৭১।

তার জন্য একশ নেকি লেখা হবে, একশ গুনাহ মাফ করা হবে, একজন দাস আজাদ করার সওয়াব হবে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে হিফাজত করা হবে। অনুরূপভাবে কেউ সন্ধ্যায় পড়লে তাকে অনুরূপ সওয়াব দেওয়া হবে।'[৩৪]

পনেরো. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় নিম্নের কালিমাটি দশবার করে পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করবেন, যারা তাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে। তার জন্য দশটি নেকি লেখা হবে, দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং তাকে দশজন মুমিন গোলাম আজাদ করার সওয়াব দেওয়া হবে। কালিমাটি হচ্ছে—

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য। তিনি জীবনদান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং সকল জিনিসের ওপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র তারই।'[৩৫]

ষোলো. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় একবার এই কালিমা পড়বে—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلاَئِكَتِكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

আল্লাহ তাআলা তার এক চতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন, যে দুইবার করে পড়বে আল্লাহ তার অর্ধেক জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন, যে তিনবার পড়বে তার তিন চতুর্থাংশ মুক্ত করবেন, আর যে চারবার

---

৩৪ মুসনাদে আহমদ, ১৬/২৯৩, হাদিস ৮৭০৪।
৩৫ নাসায়ি ফি-আমালিল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাতি, ৫৭৭-৫৭৮; কিতাবুল আজকার লিন-নববি রহ., ১/২৪৪।

পড়বে আল্লাহ তাআলা তাকে সম্পূর্ণ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন।'[৩৬]

সতেরো. আবু আইয়াশ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে এই কালিমা পড়বে—

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

সে ইসমাইলি বংশের একজন দাস আজাদ করার মতো নেকি পাবে, তার জন্য দশটি নেকি লেখা হবে, দশটি গুনাহ মাফ করা হবে এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে তাকে মুক্ত রাখা হবে। আর যদি সে সন্ধ্যায় এই কালিমা পড়ে তাহলে সকাল পর্যন্ত এমনটি করা হবে।'[৩৭]

আঠারো. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভালোভাবে অজু করে এই কালিমা বলে—

أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، و أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সেটি দিয়েই সে তাতে প্রবেশ করতে পারবে।'[৩৮]

---

৩৬ সুনানে আবু দাউদ, ৪/৩১৭; আদাবুল মুফরাদ, ১২০১; নাসায়ি ফি আমালিল ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাতি, ৯।

৩৭ সুনানে আবু দাউদ, ৪/৩১৯; মুসনাদে আহমদ, ৪/৬০।

৩৮ সহিহ মুসলিম, ১/২১০।

উনিশ. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুআজ্জিন যখন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে, তখন তোমাদের কেউ যদি খাঁটি মনে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে, মুআজ্জিন যখন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, সেও আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, মুআজ্জিন যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ বলে, সেও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ বলে, মুআজ্জিন যখন হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ বলে, সে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলে, মুআজ্জিন যখন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে, সেও আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে, মুআজ্জিন যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, সেও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৩৯]

বিশ. আতবান ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে, তার জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে।[৪০]

একুশ. সাইদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুআজ্জিনের আজান শোনার পর বলে—

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট।

তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[৪১]

বাইশ. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা

---

৩৯ সহিহ মুসলিম, ১/২৮৯।
৪০ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১/৫১৯।
৪১ সহিহ মুসলিম, ১/২৯০।

হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।'[৪২]

তেইশ. আবু জর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে মৃত্যুবরণ করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৪৩]

চব্বিশ. উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, মুহাম্মদ তার বান্দা ও রাসুল, ঈসা আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, তার কথা দ্বারা জন্মগ্রহণ করেছেন যা তিনি মরিয়মের গর্ভে নিক্ষেপ করেছেন, তিনি তার আত্মা, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। তার আমল অনুযায়ী আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[৪৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাতের আটটি দরজার যেটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করাবেন।'

পঁচিশ. উসামা রা. কালিমা পড়ার পরও এক লোককে হত্যা করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'উসামা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! সে তো অস্ত্রের ভয়ে এটা বলেছে।' রাসুল বললেন, 'তুমি কি তার অন্তর ছিঁড়ে দেখেছ যে, সে সত্যিই অস্ত্রের ভয়ে তা বলেছে কি না?'

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'কিয়ামতের দিন যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আসবে তখন তুমি কী করবে?' উসামা রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চান।' রাসুল পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিয়ামতের দিন যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আসবে তখন তুমি কী করবে?' রাসুল এই কথা বার বার বলতে থাকেন। উসামা রা. বলেন, রাসুল বার বার এই কথা বলতে থাকলে আমার মনে হলো, আমি যদি তখন (অর্থাৎ, এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর) ইসলাম গ্রহণ করতাম (তাহলে এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেঁচে যেতাম)![৪৫]

---

৪২ সুনানে আবু দাউদ, ২/৭৮।
৪৩ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৩/১১০।
৪৪ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ২/৪৭৪।
৪৫ সহিহ মুসলিম, ১/৯৭।

এ ছাড়াও কালিমার ফজিলত ও মাহাত্ম্যসংবলিত আরও অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আশা করি, এখানে যতগুলো হাদিস উল্লেখ করেছি, কালিমার ফজিলত জানার জন্য যথেষ্ট। সামনে আলোচনাপ্রসঙ্গে আরও কিছু হাদিস উল্লেখ করেছি।

উপরিউক্ত হাদিসসমূহ থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি এই কালিমা পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু বিষয়টি শুধু মুখে কালিমা পড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, বরং অবশ্যই এর সঙ্গে কালিমার সমস্ত শর্ত, রুকন ও দাবি পূর্ণ করতে হবে এবং কালিমা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে। যে ব্যক্তি সকল শর্তসহ এই কালিমা পাঠ করবে সে তিনটি জুলুম থেকে বেঁচে থাকবে। এক. শিরকের জুলুম। দুই. সকল বান্দার প্রতি জুলুম। তিন. আল্লাহর সঙ্গে শিরকের অপরাধ করার মাধ্যমে নিজের প্রতি জুলুম করা থেকেও বেঁচে যাবে।

যে ব্যক্তি এই কালিমা পড়বে এবং সকল শর্ত পূরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাত তার জন্য নিরাপদ হয়ে যাবে। দুনিয়ায় জানমাল ও পূর্ণ হিদায়াতের নিরাপত্তা। আর আখিরাতে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা লাভ করে চির শান্তি-সুখের জান্নাতে প্রবেশ করবে।

যে ব্যক্তি এই কালিমা পড়ার পর গুনাহ করে নিজের ক্ষতি করল, অতঃপর তাওবা না করে ইনতিকাল করল, সে যদি কবিরা গুনাহ ব্যতীত শুধু সগিরা গুনাহ করে, তাহলে কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কারণে আল্লাহ তার সগিরা গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। যেমনটি কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا.

যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, তাহলে আমি তোমাদের (ছোটখাটো) ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবো এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব।

আর যদি কবিরা গুনাহ করে, তাহলে সে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার মধ্যে থাকবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন অথবা তাকে শাস্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এই হাদিসগুলোর ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া রহ. খুব চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, এই হাদিসগুলো তাদের জন্য যারা এই কালিমা পড়বে এবং এর ওপরই মারা যাবে। অর্থাৎ অন্তর থেকে খাঁটি মনে এই কালিমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তা পাঠ করবে। অন্তরে কোনো ধরনের সন্দেহ ও সংশয় থাকবে না, বরং পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ইয়াকিনের সঙ্গে তা পাঠ করবে।

তাওহীদের হাকিকত ও বাস্তবতা হলো, তাওহীদ অন্তরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইখলাসের সঙ্গে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কারণ, ইখলাস অন্তরকে আল্লাহ তাআলার দিকে আকৃষ্ট করবে এবং তার থেকে কোনো গুনাহ হয়ে গেলে আন্তরিক তাওবার প্রতি আহ্বান জানাবে। অবশেষে বান্দা যখন এই অবস্থার ওপর মারা যাবে, বিনিময়স্বরূপ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, এ বিষয়ে অনেক মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণিত আছে। আবার এই বিষয়েও অনেক হাদিস আছে যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার পর গুনাহ করার কারণে অনেকে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, অতঃপর এই কালিমা তাকে জাহান্নামের নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে নিয়ে যাবে। আবার এই বিষয়েও অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আদমসন্তানের সিজদার স্থানকে স্পর্শ করা জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে এমন হাদিসও অনেক বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিয়েছেন। তবে এর জন্য রয়েছে অনেক কঠিন শর্ত। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, যারা এই কালিমা পড়ে তাদের অনেকেই সেই সমস্ত শর্ত আদায় করে না। তারা ইখলাস ও ইয়াকিন তথা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কালিমা পাঠ করে না। মৃত্যুর সময় তাদের ফিতনায় পতিত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

এই কালিমার অধিকাংশ পাঠকই ধারাবাহিক রেওয়াজ ও রীতি অনুযায়ী কালিমা পাঠ করে থাকে। তাদের অন্তরের সঙ্গে ঈমানের তেমন মিশ্রণ ঘটে না। বংশানুক্রমে তারা মুসলমান হয়ে থাকে। প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় তাদের মাঝে দেখা যায় না। সর্বদা গুনাহ ও অন্যায় কাজে মগ্ন থাকে। আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্য হয়।

যে ব্যক্তি ইখলাস ও ইয়াকিনের সঙ্গে এই কালিমা পাঠ করবে, সে কখনো গুনাহ ও পাপাচারে অভ্যস্ত হবে না। তার থেকে কখনো কোনো গুনাহ হয়ে

গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে নেবে। পূর্ণ ইখলাস ও পূর্ণ বিশ্বাসের কারণে আল্লাহ তাআলা তার নিকট সবকিছুর চেয়ে প্রিয় হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাকে যে আদেশ দেবেন তা সে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে। এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে হারাম করে দেবেন। তার থেকে যদি কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে ইখলাসের কারণে সে কৃত গুনাহ থেকে তাওবা করে নেবে। সুতরাং তার এই ঈমান, এই তাওবা, এই ইখলাস, এই ইয়াকিন এবং এই মুহাব্বত তার কোনো গুনাহকেই আর বাকি রাখবে না, বরং দিনের আলো যেমনইভাবে রাতের অন্ধকারকে মুছে দেয়, ঠিক তেমনইভাবে এগুলো তার গুনাহকে মুছে দেবে।[৪৬]

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শর্ত, রুকন ও দাবি পরিপূর্ণভাবে মানতে হবে এবং ঈমান ভঙ্গের সকল কারণ থেকে বিরত থাকতে হবে। গুনাহ ও পাপাচারের মাধ্যমে ঈমানকে ত্রুটিযুক্ত করা যাবে না। আর এ কারণেই ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ.-কে যখন কেউ একজন প্রশ্ন করল যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু প্রতিটি চাবিরই কিছু দাঁত থাকে। তুমি যদি এমন চাবি নিয়ে এসো যার দাঁত আছে, তাহলে সে চাবি তালা খুলবে আর যদি দাঁত না থাকে, তাহলে তালা খুলবে না।[৪৭]

এই কালিমা তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো জান্নাতের চাবি, আর তার দাঁত হলো সমস্ত শর্ত, রুকন, দাবি পূরণ করা এবং ঈমান ভঙ্গের কারণ থেকে বিরত থাকা।

---

৪৬ তাফসিরুল আজিজিল হামিদ, ৮৭-৮৮।
৪৭ কালিমাতুল ইখলাস, ১১।

পঞ্চম আলোচনা

তাওহীদের প্রকার :

একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাই সকল সৃষ্টির ওপর উলুহিয়্যাত এবং উবুদিয়্যাতের মালিক। তিনি ব্যতীত আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই। ইবাদত ও দাসত্ব একমাত্র তারই করতে হবে। এটিই হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্ম। তাওহীদের সকল প্রকার এই কালিমার মধ্যেই একত্রিত হয়েছে। তাওহীদ প্রথমত দুই প্রকার :

এক. তাওহিদে ইতিকাদি বা বিশ্বাসগত তাওহীদ। তাওহিদে রুবুবিয়্যাত এবং তাওহিদে আসমা ওয়াস-সিফাত তথা নাম ও গুণের তাওহীদ এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

দুই. তাওহিদে তলাবি বা অন্বেষণমূলক তাওহীদ। তাওহিদে উলুহিয়্যাত এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং তাওহীদ মোট তিন প্রকার : এক. রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ। দুই. আল্লাহর নাম ও গুণাবলির তাওহীদ। তিন. উলুহিয়্যাতের তাওহীদ।

রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলাকে তার নিজ কার্যাবলি তথা সৃষ্টি, রিজিকদান, জীবনদান, মৃত্যুদানসহ সকল কার্যের ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা।

নাম ও গুণাবলির তাওহীদ হচ্ছে, কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি ব্যতীত কুরআন ও হাদিসে আল্লাহ তাআলা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর জন্য যে-সকল নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে আল্লাহর জন্য বিশ্বাস করা। আর যে-সকল নাম ও গুণাবলি আল্লাহর জন্য হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেগুলো প্রত্যাখ্যান করা। সুতরাং আল্লাহর জন্য নির্ধারিত নাম ও গুণাবলির সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্যের স্বীকৃতি দেওয়া এবং সৃষ্টিজগতে সেগুলোর প্রভাব ও দাবি উপলব্ধি করা।

কুরআনের অনেক আয়াতে নাম ও গুণাবলির তাওহীদের আলোচনা এসেছে। যেমন সুরা হাদিদের প্রাথমিক আয়াতগুলোয়, সুরা তাহা, সুরা হাশরের শেষের আয়াতগুলো, সুরা আলে ইমরানের প্রাথমিক আয়াত এবং সুরা ইখলাসসহ অন্যান্য আরও অনেক সুরায় আল্লাহর নাম ও গুণাবলির তাওহীদের আলোচনা করা হয়েছে।

তাওহিদে উলুহিয়্যাত। এটিকে তাওহিদে উবুদিয়্যাতও বলা হয়। তাওহিদে উলুহিয়্যাত হচ্ছে, ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক বলে বিশ্বাস করা। তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। সুতরাং একমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে কাউকে শরিক করা যাবে না। সকল নবী ও রাসুলের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, মানুষকে তাওহিদে উলুহিয়্যাতের দিকে আহ্বান করা।

তাওহীদের এই প্রকারটির আলোচনা কুরআনের অনেক আয়াতে এসেছে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

> বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, একটি বিষয়ের দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা হচ্ছে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তার সঙ্গে কোনো শরিক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাকো আমরা তো অনুগত।[৪৮]

এ ছাড়া সুরা কাফিরুন, সুরা সাজদার প্রথম ও শেষে, সুরা গাফিরের প্রথম, শেষ ও মাঝে, সুরা আরাফের শুরুতে ও শেষে, এ ছাড়া কুরআনের অধিকাংশ আয়াতে তাওহীদের এই প্রকারটি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

কুরআন অবতীর্ণের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওহীদ প্রমাণ করা। কুরআনের মধ্যে হয়তো আলোচনা করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার সত্তা,

---

৪৮ সুরা আলে ইমরান, ৬৪।

গুণাবলি, কার্যাবলি ও কথা সম্পর্কে। এটি হলো তাওহিদে ইতিকাদি এবং তাওহিদে আসমা ওয়াস-সিফাত। অথবা আলোচনা করা হয়েছে, শিরক থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানানোর এবং গাইরুল্লাহর ইবাদতের ধরন ও প্রকৃতির। এটি হচ্ছে তাওহিদে তালাবি, তাওহিদে উলুহি বা তাওহিদে আমলি। কুরআনে হয়তো কোনো একটি বিষয়ের আদেশ করা হয়েছে অথবা কোনো একটি বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এটি তাওহীদের হক ও দাবির অন্তর্ভুক্ত এবং তাওহীদের পূর্ণতার জন্য শর্ত। অথবা কুরআনে তাওহীদবাদীদের দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কার ও সম্মানের ঘোষণা করা হয়েছে। এটি হলো, তাওহীদের পুরস্কার। অথবা কুরআনে কাফির-মুশরিকদের ওপর দুনিয়া ও আখিরাতে যে বিপদ ও দুর্যোগ নিপতিত হবে বা হয়েছে তার আলোচনা করা হয়েছে। এটি হলো তাওহীদ অস্বীকার করার শাস্তি। সুতরাং পূর্ণ কুরআনেই তাওহীদ, তাওহীদের হক ও দাবি, তাওহীদ বিশ্বাসকারীদের পুরস্কার এবং শিরক ও মুশরিকদের অবস্থা ও তাদের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ আলোচনা

সকল নবী-রাসুলের দাওয়াতের মূল ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ :

সকল নবী-রাসুলই তাদের সম্প্রদায়কে এই কালিমা তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর দিকে আহ্বান করেছেন। তারা তাদেরকে আহ্বান করেছেন এক আল্লাহর ইবাদত করতে। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করতে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সকল গোত্রের নিকটই কোনো না কোনো নবী প্রেরণ করেছেন। আর তারা সকলেই মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন, যার কোনো শরিক নেই। ইরশাদ হয়েছে—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.

আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছেই এই মর্মে রাসুল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাকো। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যককে আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন। আর কিছুসংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো মিথ্যাবাদীদের কেমন পরিণতি হয়েছিল।[৪৯]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

---

৪৯ সুরা নাহল, ৩৬।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

আপনার পূর্বে প্রেরিত প্রত্যেক রাসুলকে আমি এই আদেশ দিয়েই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত করো।[৫০]

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ.

আপনার পূর্বে আমি যে-সকল রাসুল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত আমি কি কোনো উপাস্য স্থির করেছিলাম ইবাদতের জন্য?[৫১]

এই সকল আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সকল নবীই মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের অন্যত্র আরও বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন—

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

নিশ্চয় আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি। সে তাদেরকে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো উপাস্য নেই।

---

৫০ সুরা আম্বিয়া, ২৫।
৫১ সুরা যুখরুফ, ৪৫।

আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।[৫২]

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ.

আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো উপাস্য নেই।[৫৩]

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ.

সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো উপাস্য নেই।[৫৪]

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ.

আমি মাদইয়ানের কাছে তাদের ভাই শুআইবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো উপাস্য নেই।[৫৫]

---

৫২ সুরা আরাফ, ৫৯।
৫৩ সুরা আরাফ, ৬৫।
৫৪ সুরা আরাফ, ৭৩।
৫৫ সুরা আরাফ, ৮৫।

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.

মাসিহ বলেন, হে বনি ইসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।[৫৬]

এ সকল আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সকল নবী-রাসুলের দাওয়াত ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই এই কালিমার প্রতি।

সপ্তম আলোচনা

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্ত :

কেবল মুখে মুখে কালিমা পড়লে কোনো লাভ নেই, যদি না এই কালিমার শর্ত ও দাবিসমূহ আদায় করা হয়। কারণ মুনাফিকরাও এই কালিমা পড়ত। তথাপিও তারা জাহান্নামের একেবারে নিম্নস্তরে থাকবে। কারণ তারা যদিও মুখে মুখে কালিমা পড়ত, কিন্তু তারা কালিমার ওপর আমল করত না এবং এই কালিমার শর্তসমূহ আদায় করত না। তেমনইভাবে ইহুদিরাও এই কালিমা পড়ত। তথাপিও তারা সবচেয়ে বড় কাফির। কারণ, তারা কালিমার শর্তসমূহ রক্ষা করত না এবং এর প্রতি ঈমান আনত না। অনুরূপভাবে বর্তমানে কবরপূজারি ও মাজারপূজারিরা মুখে মুখে এই কালিমা পড়ে, কিন্তু তারা তাদের কথা, কাজ ও বিশ্বাসে এর বিরোধিতা করে। সুতরাং তাদের মুসলিম হওয়ার দাবি বা মুখে কালিমা পড়া তাদের কোনো কাজেই আসবে না। কারণ তারা

---

৫৬ সুরা মায়িদা, ৭২।

এই কালিমার শর্তসমূহ আদায় করে না বরং তাদের কথা, কাজ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে এই কালিমার বিরোধিতা করে।

কালিমার শর্ত সাতটি :

১. ইলম তথা জ্ঞানলাভ। ২. ইয়াকিন তথা বিশ্বাস। ৩. কবুল তথা গ্রহণ। ৪. ইনকিয়াদ বা আত্মসমর্পণ। ৫. সিদক তথা সত্যায়ন। ৬. ইখলাস তথা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। ৭. মুহাব্বত তথা ভালোবাসা।

কেউ কেউ কালিমার শর্ত আটটি বলেছেন। উল্লিখিত সাতটির সঙ্গে আরেকটি হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর বিপরীতে সবকিছু অস্বীকার করা।

প্রতিটি শর্তের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

প্রথম শর্ত : ইলম তথা জ্ঞান, এটি জাহালত বা মূর্খতার বিপরীত। এই শর্তের সারকথা হচ্ছে, কালিমার অর্থ ও মর্মকে ভালোভাবে জানা। অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, কালিমার এই অর্থটা জানতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে এও জানতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর যা-কিছুর ইবাদত করা হয় তার সবই মিথ্যা ও বাতিল। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ.

জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই।

হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, এই কালিমার ওপর ঈমান অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৫৭]

দ্বিতীয় শর্ত : ইয়াকিন তথা দৃঢ় বিশ্বাস, এটি সংশয় ও সন্দেহের বিপরীত। এর মর্ম হচ্ছে, অবশ্যই কালিমা পাঠকারীকে অন্তর থেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই। কারণ, ইলমুল ইয়াকিন বা দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত ঈমান কোনো কাজে আসে না।

---

৫৭ সহিহ মুসলিম, ১/৫৫।

ঈমান কোনো সন্দেহ, সংশয় ও দ্বিধাগ্রস্ততা গ্রহণ করে না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

> তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধনসম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।[৫৮]

হাদিসে এসেছে, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোনো বান্দা যখন অন্তরে কোনোপ্রকার সন্দেহ ও সংশয় ব্যতীত বলে—

أشهد أن لا إله إلله و أني رسول الله.

> আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল।

এবং এই কালিমার ওপর মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৫৯]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তুমি আমার এই পাদুকা দুটি নিয়ে যাও। তারপর এই দেয়ালের ওপাশে যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে সে যদি অন্তর থেকে সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কালিমার সাক্ষ্য দেয়, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।'

উল্লিখিত আয়াত ও হাদিস থেকে এটি স্পষ্ট যে, জান্নাতে প্রবেশের জন্য শর্ত হলো, দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কালিমা পাঠ করা। অন্তরে কালিমার ব্যাপারে কোনোপ্রকার সংশয় ও সন্দেহ থাকতে পারবে না। আর যদি এই শর্ত না

---

৫৮ সুরা হুজুরাত, ১৫।
৫৯ সহিহ মুসলিম, ১/৫৬।

পাওয়া যায়, তাহলে মাশরুত তথা শর্তযুক্ত বিষয় তথা জান্নাতও পাওয়া যাবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, ইয়াকিন হলো পূর্ণ ঈমান আর ধৈর্য হলো ঈমানের অর্ধেক। তিনি আরও বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার ঈমান, ইয়াকিন এবং ফিকহ তথা দ্বীনের জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।[৬০]

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, যদি কোনো অন্তরে প্রকৃত ইয়াকিন সৃষ্টি হয়, তাহলে সে অন্তর জাহান্নাম থেকে পালিয়ে জান্নাতের দিকে যাওয়ার আগ্রহে উড়াল দেবে।

তৃতীয় শর্ত : কবুল তথা গ্রহণ করা, এটি প্রত্যাখ্যান করার বিপরীত। এর সারমর্ম হচ্ছে, এই কালিমা এবং কালিমার দাবিসমূহ মুখে স্বীকার করতে হবে এবং অন্তর থেকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে হবে। যেমন অনেক মুশরিক এই কালিমার অর্থ জানে এবং তারা মুখে তা পাঠও করে, কিন্তু অন্তর থেকে গ্রহণ না করার কারণে তারা মুমিন হয় না, তারা বরং অবিশ্বাসী ও মুশরিকই থেকে যায়। আর এই কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তিরস্কার করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ.

তাদেরকে যখন বলা হতো, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত।[৬১]

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ.

তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালিমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করে।[৬২]

---

৬০ ফাতহুল বারি, ১/৪৮।
৬১ সুরা সাফফাত, ৩৫।
৬২ সুরা আনআম, ৩৩।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত সে বৃষ্টির ন্যায় যা কোনো ভূমিতে বর্ষিত হয়, আর সে ভূমির উৎকৃষ্ট কতকাংশ বৃষ্টির পানি গ্রহণ করে এবং তা দিয়ে প্রচুর তরতাজা ঘাসপাতা উৎপন্ন করে। আর কতকাংশ হলো অনুর্বর মাটি, যা পানি আটকে রাখে। ফলে আল্লাহ তাআলা তা দিয়ে মানুষের উপকার পৌছান এবং তারা নিজেরা তা থেকে পান করে, অন্যদের পান করায় ও পশু চরায়। আর বৃষ্টির পানি সে ভূমির আরও কতকাংশে বর্ষিত হয়, যা উঁচু পার্বত্য টিলাময়, ফলে তা কোনো পানি আটকে রাখে না, কোনো ঘাসপাতাও উৎপন্ন করে না। এর হলো সেসব লোকের উপমা, যারা আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করে এবং আল্লাহ তাদের সেসব দিয়ে উপকৃত করেন যা নিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। ফলে সে ইলম হাসিল করে অন্যকেও শিক্ষা দেয়। আর তৃতীয় দৃষ্টান্ত হলো, ওই লোকদের যারা তার প্রতি মাথা তুলে তাকায় না এবং আল্লাহর ওই হিদায়াত কবুল করে না, যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে।'[৬৩]

চতুর্থ শর্ত : ইনকিয়াদ তথা আত্মসমর্পণ, কালিমা ও কালিমার দাবির সামনে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। এর সারমর্ম হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করতে হবে, তার দেওয়া শরিয়ত অনুযায়ী আমল করতে হবে। এই ব্যাপারে কোনো ধরনের সংশয় বা সন্দেহ পোষণ করতে পারবে না। ইনকিয়াদ (আত্মসমর্পণ) এবং কবুল (গ্রহণ করা) প্রায় কাছাকাছি বিষয়। তবে দুইটির মাঝে এতটুকু পার্থক্য ধরা যায় যে, ইনকিয়াদ হলো আমলের মাধ্যমে আনুগত্য করা। আর কবুল হলো কালিমার সঠিক অর্থ গ্রহণ করে তা কথার মাধ্যমে প্রকাশ করা। আর দুইটার জন্যই আনুগত্য অত্যাবশ্যক। আত্মসমর্পণ হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সমস্ত শর্তের সামনে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ.

> তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তার আজ্ঞাবহ হও।[৬৪]

---

৬৩ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১/১৭৫; সহিহ মুসলিম, ১৭৮৭।
৬৪ সুরা যুমার, ৫৪।

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ.

যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে, সৎকাজে নিয়োজিত থাকে, তার চেয়ে উত্তম ধর্ম কার?[৬৫]

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ অভিমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে।[৬৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি বা মনের চাহিদাকে আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুগামী করবে।'[৬৭]

এটিই হলো ইনকিয়াদ বা আনুগত্যের পূর্ণরূপ। সুতরাং তাওহীদকে হৃদয়ে পরিপূর্ণরূপে ধারণ করতে হলে নিজের সকল চাহিদাকে আল্লাহর দ্বীনের অনুগামী করতে হবে।[৬৮]

পঞ্চম শর্ত : সিদক তথা সত্যায়ন, এটি কিজব তথা মিথ্যার বিপরীত। এর সারমর্ম হচ্ছে, অন্তর থেকে এমনভাবে সত্য মনে করে এই কালিমা পাঠ করতে হবে যে, জবান অন্তরের অনুগামী এবং অন্তর জবানের অনুগামী হবে। যদি কেবল মুখে কালিমা পড়ে, কিন্তু অন্তর তার প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে সে হবে পরিপূর্ণ মুনাফিক। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

---

৬৫ সুরা নিসা, ১২৫।
৬৬ সুরা লুকমান, ২২।
৬৭ জামিউল উলুম ওয়াল-হিকাম, ৩৩৮।
৬৮ মাআরিজুল কবুল, ২/৪২২।

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ.

মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।[৬৯]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ঈমানের সাক্ষ্যদানকে মিথ্যা ও বাতিল বলে ঘোষণা করছেন।

মনে সততা ও বিশ্বাস নিয়ে কালিমা পড়া ঈমানের জন্য শর্ত। এটি সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণিত। হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মন থেকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।[৭০]

ষষ্ঠ শর্ত : ইখলাস তথা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, এটি শিরকের বিপরীত। এর সারমর্ম হচ্ছে, খাঁটি মনে সকলপ্রকার শিরক ও শিরকের সন্দেহমুক্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা এবং তার ইবাদত করা। ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো দিক থেকেই আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা যাবে না। আর যখন আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারও ইবাদত করা হবে, সেটা যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন এবং ইবাদতটা আল্লাহর পরিবর্তে যারই করা হোক না, যেমন নবী, ফিরিশতা, জিন, অলি-আওলিয়া তা শিরক বলে গণ্য হবে। এর মাধ্যমে কালিমার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে সে মুমিন বা ঈমানদার হতে পারবে না। কারণ তার কালিমায় ইখলাসের শর্ত পাওয়া যায়নি।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ.

---

৬৯ সুরা মুনাফিকুন, ১।
৭০ ফাতহুল বারি, ১/২২৬।

অতএব, আপনি নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করুন।[৭১]

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে। এটিই সঠিক ধর্ম।[৭২]

হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্তর ও মনের গহিন থেকে ইখলাসের সঙ্গে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফাআত লাভে সৌভাগ্যবান হবে।'[৭৩]

সপ্তম শর্ত : মুহাব্বত তথা ভালোবাসা। এটি ঘৃণার বিপরীত। বান্দার ওপর আবশ্যক হলো আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ তাআলা যা পছন্দ করেন ভালোবেসে তা করা। সুতরাং কালিমায়ে তাওহীদকে ভালোবাসতে হবে এবং কালিমার সকল দাবিকেও ভালোবাসতে হবে। এটি কালিমার গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ.

আর কোনো লোক এমনও রয়েছে, যারা অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনই ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি।[৭৪]

---

৭১ সুরা যুমার, ২-৩।
৭২ সুরা বাইয়িনা, ৫।
৭৩ ফাতহুল বারি, ১/১৯৩।
৭৪ সুরা বাকারা, ১৬৫।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না।[৭৫]

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।[৭৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে। এক. আল্লাহ ও তার রাসুল অন্য সকলকিছু থেকে প্রিয় হওয়া। দুই. কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই

৭৫ সুরা মায়িদা, ৫৪।
৭৬ সুরা আলে ইমরান, ৩১।

ভালোবাসা। তিন. কুফরে প্রত্যাবর্তন করাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় অপছন্দ করা।'[৭৭]

বান্দা যখন আল্লাহকে ভালোবাসবে তখন সে তাই ভালোবাসবে যা আল্লাহ ও তার রাসুল ভালোবাসেন। কারণ, কেউ যখন কাউকে ভালোবাসে তখন তার নিকট সেগুলোই প্রিয় হয়ে ওঠে যেগুলো তার প্রেমাস্পদ ভালোবাসে। এটাই প্রকৃত ভালোবাসার দাবি। আর এইজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে কিছু দান করে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকে, সে অবশ্যই তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিল।[৭৮]

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, ভালোবাসার একটি শর্ত হলো, তুমি যাকে ভালোবাসো তার পছন্দ ও ভালোলাগা বিষয়ের সঙ্গে নিঃশর্ত সহমত পোষণ করবে। তুমি যদি তাকে ভালোবাসার দাবি করো আর তার পছন্দ ও ভালোলাগা বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করো, তাহলে তুমি তোমার ভালোবাসায় মিথ্যাবাদী। তুমি তোমার প্রেমাস্পদের শত্রুদেরকে ভালোবাসবে আবার তার সঙ্গে ভালোবাসার দাবি করবে, এটা তো হতে পারে না।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার ভালোবাসা প্রার্থনা করি। আপনি যাকে ভালোবাসেন তার ভালোবাসা চাই এবং প্রতিটি এমন কাজকে ভালোবাসতে চাই, যার মাধ্যমে আপনার নৈকট্যলাভ করা যায়। আমিন!

অষ্টম শর্ত : আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে আর যা-কিছুর ইবাদত করা হয় তাদের অস্বীকার করা। আর তা দুইভাবে করতে হবে। এক. আল্লাহ ছাড়া আর সকল উপাস্যকে বাতিল বা মিথ্যা বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা। দুই. সর্বদিক থেকে এসবের উপাসনা থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

৭৭ সহিহ বুখারি, ১৬; সহিহ মুসলিম, ১/৬৬।
৭৮ সুনানে আবু দাউদ।

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'-কে মানবে না এবং আল্লাহয় বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙার নয়। আর আল্লাহ সবই শোনেন এবং জানেন।[৭৯]

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাকো।[৮০]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব রহ. বলেন, তাগুতকে অস্বীকার করার অর্থ হলো, আল্লাহর পরিবর্তে অন্য সকল উপাস্যের উপাসনা অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের যারা উপাসনা করে, তাদের কাফির মনে করা এবং তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা।[৮১]

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, প্রত্যেক ওই ব্যক্তি বা বস্তুকে তাগুত বলা হয়, যার মাধ্যমে বান্দা সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহর অবাধ্য হয়, হোক সে মাবুদ তথা উপাস্য, মাতবু তথা অনুসৃত, নেতা বা অনুসরণীয় কেউ।

তাগুতের সংখ্যা অনেক। এর মধ্য থেকে প্রধান পাঁচটি এখানে উল্লেখ করছি—

এক. অভিশপ্ত ইবলিস শয়তান।

দুই. এমন ব্যক্তি যার ইবাদত করা হয় আর সেও এই বিষয়ে সন্তুষ্ট।

---

৭৯ সুরা বাকারা, ২৫৬।

৮০ সুরা নাহল, ৩৬।

৮১ তাগুতকে তাগুত বলে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, তাগুত এসেছে তুগয়ান শব্দ থেকে, যার অর্থ, সীমালঙ্ঘন করা। আর তাগুত যেহেতু স্রষ্টা ও শরিয়তের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করে, তাই তাকে তাগুত বলা হয়।—সম্পাদক

তিন. যে মানুষকে তার নিজের উপাসনার প্রতি আহ্বান করে।

চার. যে গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়-আশয় জানে বলে দাবি করে।

পাঁচ. যে মানবরচিত বিধিবিধানের আলোকে বিচারকার্য পরিচালনা করে।

হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং আল্লাহর পরিবর্তে অন্য সকল ইলাহকে অস্বীকার করে, তার জান ও মাল নিরাপদ এবং তার হিসাব-কিতাব আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে।'[৮২]

সুতরাং যারা চায় না যে, মানুষ তাদের ইবাদত করুক, আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকে ডাকুক, যেমন নবী-রাসুল, প্রকৃত অলি-আওলিয়া ও ফিরিশতা, তারা তাগুত নয়। তাগুত হচ্ছে ওই সকল শয়তান যারা মানুষকে নিজেদের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে এবং কুফরকে মানুষের নিকট শোভনীয় করে তোলে। তাগুত এবং আল্লাহর পরিবর্তে যতকিছুর ইবাদত করা হয়, তাদের অস্বীকার করা ওয়াজিব। এই বিষয়ে দলিল হলো ইবরাহিম আ.-এর বাণী। তিনি কাফিরদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, কুরআনে আল্লাহ সে কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> যখন ইবরাহিম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা যাদের পূজা করো, তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমার সম্পর্ক তার সঙ্গে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন।[৮৩]

তিনি সকল বাতিল ও মিথ্যা উপাস্য থেকে আল্লাহ তাআলাকে পৃথক করেছেন। এই সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টিটাই হলো কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রকৃত দাবি। যেমন এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

৮২ সহিহ মুসলিম, ১/৫৩।
৮৩ সুরা যুখরুফ, ২৬-২৭।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

এ কথাটিকে সে অক্ষয় বাণীরূপে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গেছে, যাতে তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।[৮৪]

যেমনটি পূর্বোল্লেখিত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। গুরুত্বের বিবেচনায় এখানে হাদিসটি পুনরায় উল্লেখ করছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং আল্লাহর পরিবর্তে অন্য যাদের উপাসনা করা হয় তাদের অস্বীকার করে, তার জান ও মাল নিরাপদ এবং তার হিসাব-কিতাব আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে।[৮৫]

এই হাদিসে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রকৃত অর্থ ও মর্ম পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, কেবল কালিমা উচ্চারণ করার মাধ্যমে জান ও মাল নিরাপদ হবে না, বরং উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ ব্যতীত আর যাদের উপাসনা করা হয় তাদের মনেপ্রাণে ঘৃণা ও অস্বীকার করতে হবে। এই বিষয়ে যদি সামান্য সন্দেহ করে বা গাইরুল্লাহকে অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকে তাহলে সে প্রকৃত মুমিন নয়, তার জান ও মাল নিরাপদ নয়।

এটি সাধারণ কোনো বিষয় নয়। বরং বিষয়টির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বোঝার তাওফিক দান করুন। কায়মনোবাক্যে তার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে ক্ষমা করে দেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সকলপ্রকার অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে নিরাপদ রাখেন। আমিন!

---

৮৪ সুরা যুখরুফ, ২৮।
৮৫ সহিহ মুসলিম, ১/৫৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কালিমার দ্বিতীয়াংশ 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর আলোচনা

প্রথম আলোচনা

'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর মর্ম ও দাবি :

এক. কালিমায় 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর অর্থ হচ্ছে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল। এর মর্ম হচ্ছে, এটি মুখে স্বীকার এবং অন্তরের গভীর থেকে বিশ্বাস করতে হবে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তাআলা তাকে সকল সৃষ্টির জন্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মানুষ ও জিনজাতির জন্য তার অনুসরণ করা ওয়াজিব।

দুই. 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর দাবি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা আদেশ করেছেন তা যথাযথ মানা ও পালন করা। তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা। তিনি যে বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন ও বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাকা। তিনি যেভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে বলেছেন, ঠিক সেভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে যে শরিয়ত দিয়েছেন, পরিপূর্ণভাবে কথা, কাজ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে তার অনুসরণ করা। আল্লাহর তাআলা, তার ফিরিশতাকুল, তার প্রেরিত কিতাবসমূহ, তার রাসুলগণ, কিয়ামত দিবস ও তাকদিরের ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আনা। ইসলামের প্রতিটি রুকন সঠিকভাবে পালন করা। যেমন কালিমার সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ পড়া, জাকাত দেওয়া, রোজা রাখা, হজ করা, এ ছাড়াও আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে যে-সকল বিধিবিধান অবতীর্ণ করেছেন সেগুলো বিশ্বাস করা ও মানা।

দ্বিতীয় আলোচনা

রাসুল ﷺ এর পরিচয়লাভ :

এটি সেই তিন বিষয়ের একটি যা প্রতিটি মুসলমানের জানা আবশ্যক। তিনটি বিষয় হচ্ছে, রব, দ্বীন ও রাসুল। অর্থাৎ বান্দাকে অবশ্যই তার রবকে চিনতে হবে, তার দ্বীন বা ধর্ম কী তা জানতে হবে এবং তার নবী তথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তা জানতে হবে।

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হিশাম। হিশাম কুরাইশ বংশের, কুরাইশ আরবের এক সম্ভ্রান্ত গোত্র। আর আরব হলো ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম আ.-এর বংশধর। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুনিয়ায় ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন। ৪০ বছর নবুয়তের পূর্বে এবং ২৩ বছর নবুয়তপ্রাপ্তির পরে। তার নবুয়ত শুরু হয়েছে 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক' তথা সুরা আলাকের প্রাথমিক আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে। পরে তিনি জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাকে সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, মানুষকে শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে তাওহীদের আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করেছেন। নবুয়তপ্রাপ্তির পর তিনি প্রথম দশ বছর তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে মিরাজের সৌভাগ্য দান করেছেন। এ সময় তার ও তার উম্মতের ওপর নামাজ ফরজ করা হয়। নামাজ ফরজ হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন বছর মক্কায় ছিলেন। অতঃপর আল্লাহর আদেশে তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতের পর মদিনায় তার অবস্থান দৃঢ় হলে ধীরে ধীরে ইসলামের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিধান একে একে অবতীর্ণ হতে থাকে। যেমন জাকাত, রোজা, হজ, জিহাদ, আজান, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ ইত্যাদি। এভাবে মদিনায় দশ বছর থাকার পর তিনি ইনতিকাল করেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পরও তার দ্বীন বাকি রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। এই উম্মতের জন্য দ্বীনকে আকড়ে ধরার চেয়ে কল্যাণকর আর কিছু নেই এবং এই দ্বীন থেকে বিমুখ থাকার চেয়ে মন্দ ও অকল্যাণেরও কিছু নেই। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসুল। তার পর আর কোনো সত্য নবী ও রাসুল আসবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাকে সকল সৃষ্টির জন্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং মানুষ ও জিনজাতির ওপর তার অনুসরণ ফরজ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে, আর যে তার অবাধ্য হবে সে জাহান্নামে যাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ জীবন সম্পর্কে জানতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে সিরাতের নির্ভরযোগ্য কিতাব অধ্যয়ন করতে হবে। সিরাত অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা জানতে পারব, কেমন ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ, কেমন ছিল তার দাওয়াত, তার জিহাদ এবং লেনদেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ জীবন জানার এবং পরিপূর্ণভাবে তার অনুসরণ করার তাওফিক দান করেন। দ্বীনের ওপর আমাদের কদম সুদৃঢ় রাখেন। আমিন!

তৃতীয় আলোচনা

নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ অনেক নিদর্শন ও মুজিজা প্রকাশিত হয়েছে। সকল নবী-রাসুল থেকেই তাদের নবুয়তের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন নিদর্শন ও মুজিজা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আমাদের নবীর নিদর্শন অন্য সকল নবীর নিদর্শন ও মুজিজার চেয়ে বেশি ও জীবন্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদর্শন ও মুজিজাগুলো প্রত্যেক জামানায় এত এত মানুষ বর্ণনা করেছেন এবং জামানার শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত মানুষজন বর্ণনা করেছেন যে, ফলে মনে হয় তা যেন আমাদের কালেই ঘটেছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় মুজিজা হলো কুরআন। আর কুরআনের মুজিজার সবচেয়ে বড় দিক হলো, সেই চৌদ্দশ বছর পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া কিতাবটি আজও ঠিক সেরকমই আছে যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছে। একটি হরফ কেন, একটি হরকত বা নুকতারও কোনো পরবর্তন, পরিবর্ধন হয়নি। কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য প্রতিটি ঘোষণা এতটাই বাস্তব ও জীবন্ত যে, আপনি যদি বুঝে বুঝে কুরআন পাঠ করেন, তাহলে মনে হবে যেন এই কুরআন মাত্রই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কেউ এই কুরআনের মতো অন্য কোনো গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয়নি, আর সক্ষম হবেও না কোনোদিন। এমনকি তারা এই কুরআনের ছোট্ট একটি সুরার মতো সুরা রচনা করতেও সক্ষম হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল মানুষও যদি একত্র হয়ে চেষ্টা করে তবুও সক্ষম হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.

বলুন, যদি মানব ও জিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য একত্রিত হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না।[৮৬]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর পূর্বেকার নবী-রাসুলদের আনুগত্য ও অনুসরণ বাতিল হয়ে গেছে। তবে তাদের নবুয়ত ও রিসালাতের স্বীকৃতি এখনো রয়েছে। অর্থাৎ তারা যে সত্য নবী ও রাসুল ছিলেন তা স্বীকার করতে হবে এবং এই বিষয়ে ঈমান আনতে হবে। তবে তাদের অনুসরণ করা এখন আর বৈধ হবে না। আর এই কারণেই ইহুদিদের মুসা আ.-এর প্রতি ঈমান আনা সম্ভব হবে না, যদি তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের প্রতি ঈমান না আনে। অনুরূপভাবে খ্রিষ্টানদের ঈসা আ.-এর প্রতি ঈমান আনার দাবি সত্য প্রমাণিত হবে না, যতক্ষণ না তারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে। কারণ, এক নবীর নবুয়তকে অস্বীকার করার অর্থ সকল নবীর নবুয়তকেই অস্বীকার করা। আর তাদের এই ঈমান তাদের কোনো কাজেই আসবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী, তদুপরি আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক শাস্তি। যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তার রাসুলের ওপর এবং তাদের কারও প্রতি ঈমান আনতে

---

৮৬ সুরা বনি ইসরাইল, ৮৮।

গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সওয়াব প্রদান করা হবে। বস্তুত, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।[৮৭]

শুধু মুসা আ. এবং ঈসা আ.-এর নবুয়তের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমান আনা বা মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ মুসলমানরাও মুসা ও ঈসা আ.-এর নবুয়তের ওপর ঈমান আনে। তবে তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। কারণ, তাদের প্রতি ঈমান আনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার ওপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত। যদি তিনি (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) না হতেন, তাহলে আমরা তাদের নবুয়তের ব্যাপারে জানতে পারতাম না। তাদের ব্যাপারে আহলে কিতাবদের সংবাদটা তাদের প্রতি ঈমান আনাকে ওয়াজিব করে না। যদি কুরআন এবং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না থাকতেন, তাহলে আমরা পূর্বের নবীদের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারতাম না। সুতরাং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ওপর অবতীর্ণ হওয়া কিতাবই কেবল মুসা আ. এবং ঈসা আ.-এর নবুয়তকে স্বীকার করে, ইহুদি-খ্রিষ্টান নয়। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ও প্রকাশই তাদের নবুয়তের প্রমাণ। কারণ তারা দুজনই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ও তার নবুয়ত সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ.

স্মরণ করো, যখন মরিয়মতনয় ঈসা বলল, হে বনি ইসরাইল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তার নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, এ তো এক প্রকাশ্য জাদু।[৮৮]

---

৮৭ সুরা নিসা, ১৫০-১৫২।
৮৮ সুরা সাফ, ৬।

সুতরাং তিনি যখন আগমন করলেন তখন তার আগমনটাই নবুয়তের জন্য সত্যায়ন। কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেন—

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ.

তিনি বরং সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রাসুলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন।[৮৯]

সুতরাং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন দুই দিক থেকেই তাদের নবুয়তের সত্যায়ন। প্রথমত তারা তার আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত তিনি তাদের নবুয়তকে সত্যায়ন করেছেন। তিনি যদি মিথ্যা নবী হতেন, তাহলে নবীদের শত্রুদের মতো তিনি তার পূর্বের কাউকেই স্বীকার করতেন না।[৯০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত সত্য হওয়ার অন্যতম বড় একটি দলিল হলো, ইহুদিরা যখন তাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, তিনি তাদেরকে মৃত্যুকামনা করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে মৃত্যুকামনা করো। যেমনটি কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

তোমরা মৃত্যুকামনা করো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।[৯১]

কিন্তু তাদের কেউই এই বিষয়ে ধৃষ্টতা দেখিয়ে মৃত্যুকামনা করেনি। যদিও তারা সকলেই তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত এবং তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করত। কারণ তিনি যখন তাদেরকে বলেছেন, তারা যদি আমার কথায় সাড়া দিয়ে মৃত্যুকামনা করে, তাহলে তাদের মৃত্যু অবধারিত। তারা ভয় পেয়ে যায় এবং মৃত্যুকামনা করতে অস্বীকার করে। কারণ, তারা তো তাদের কিতাব থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে জেনেছে। তারা যদি তাদের কিতাব থেকে তার সত্যতা সম্পর্কে না জানত, তাহলে তারা

---

৮৯ সুরা সাফফাত, ৩৭।
৯০ দাকায়িকুত তাফসির, ৪/৩৪; ইগাসাতুল লাহফান, ২/৩৫০।
৯১ সুরা বাকারা, ৯৪।

এই আহ্বানে সাড়া দিত এবং দুই দলের মধ্যে কে সত্য এটা জানার জন্য প্রত্যেকে আল্লাহ তাআলার নিকট মৃত্যুকামনা করত। এ বিষয়ে কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.

বলুন, হে ইহুদিগণ, যদি তোমরা দাবি করো যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কেউ নয়, তবে তোমরা মৃত্যুকামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনো মৃত্যুকামনা করবে না। আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।[৯২]

এগুলো ছাড়াও নবুয়তের আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে,[৯৩] সামনে তা আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

---

৯২ সুরা জুমুআ, ৬-৭।

৯৩ নবুয়ত ও রিসালাতের প্রামাণিক মুজিজাগুলো যে কেবল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় ঘটেছে তা নয়। বরং তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পরও বিভিন্ন সময় ঘটেছে এবং বর্তমান সময়েও মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটছে। কিছুদিন পূর্বেকার এমনই একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। ঘটনাটি দেখে উত্তর নাইজেরিয়ার চারটি গ্রাম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। ঘটনাটি ১৫/৮/১৪১০ হিজরি মুতাবেক ১২/৩/১৯৯১ সালে সৌদি আরবের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এক পথভ্রষ্ট ইসলামবিদ্বেষী জনসম্মুখে ইসলাম ও কুরআন নিয়ে ব্যঙ্গ এবং তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে। সে কুরআনে বর্ণিত 'মুবাহালা'-এর পদ্ধতিতে আল্লাহর নিকট মৃত্যুকামনা করে। জনসম্মুখে বলে, যদি কুরআন ও ইসলাম সত্য হয় তাহলে আমি যেন জীবিত বাড়িতে ফিরে যেতে না পারি। পরে তাই ঘটল। আল্লাহ তাআলা তাকে আর জীবিত বাড়িতে ফিরিয়ে নেননি। বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে পথেই তার মৃত্যু ঘটে।

ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর নাইজেরিয়ার গুনফুলা প্রদেশের বুব নামক একটি গ্রামে। এই ঘটনার প্রভাবে সেই গ্রাম এবং তার আশপাশের আরও তিনটি গ্রামের সকল মানুষ ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অনেকের সাথে কথা বলে এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা বলেন, বুব গ্রামের গির্জার পাদরি মিথ্যাবাদী উমর গিমু গির্জায় এক ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে ইসলাম ও কুরআন নিয়ে অনেক মিথ্যাচার করে এবং কুরআন ও ইসলাম নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে অনেক মনগড়া কথা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ অনেক। সেগুলোকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়।

এক. যা রাসুলের আগমনের পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। যেমন মুসা ও ঈসা আ.-এর মুজিজা।

দুই. যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় প্রকাশ পেয়েছে এবং এখনো তা বাকি আছে। যেমন কুরআন, ইলম ও ঈমান। এগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের নিদর্শন। এ ছাড়া তার নিয়ে আসা শরিয়ত এবং তার পর থেকে যুগে যুগে অলি-আওলিয়াদের থেকে প্রকাশিত শত শত কারামত এবং তার দ্বীনের প্রসারও নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের প্রমাণ। এ ছাড়া পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবেও তার বিভিন্ন গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং সেগুলোর প্রতিটিই তার সঙ্গে মিলেছে।

বলে। সে তার বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে এসে বলে, যদি কুরআন ও ইসলাম সত্য হয় তাহলে সৃষ্টিকর্তার কাছে আমি প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে বাড়িতে জীবিত ফিরিয়ে না নেন।

বক্তৃতা শেষে পাদরি মহোদয় নিশ্চিন্তে গির্জা থেকে বের হয়ে তার বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। সে মনে মনে নিশ্চিত ছিল, তার কিছুই হবে না, নিরাপদে সে বাড়ি যেতে পারবে এবং সামনে সে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের একহাত নেবে। সে ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে তার মিথ্যা অপবাদগুলোকে আরও জোরালোভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। গির্জা থেকে পাদরির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটি ছিল একেবারে নিরাপদ। রাস্তায় বিপদের কোনো আশঙ্কাই ছিল না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় পা পিছলে সে রাস্তার পাশের ছোট্ট এক নালায় পড়ে যায়। খবর পেয়ে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে পৌঁছার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়। হাসপাতালকর্তৃপক্ষ তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে বাধ্য হয়ে তারা তাকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকেও তাকে ফিরিয়ে দিলে তারা তাকে অন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। এভাবে কয়েকটি হাসপাতাল ঘুরে তারা নিশ্চিত হয় যে, সে আর জীবিত বাড়ি ফিরে যাবে না। তারা আসলে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, এভাবে এত সহজে মানুষ মরতে পারে। লোকটির শরীরে আঘাতের সামান্য দাগ পর্যন্ত নেই। এরচেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হলো, সে যখন পা পিছলে পড়ে যায়, তখন সাথে সাথে এক লোক তাকে টেনে তুলতে গিয়ে সেও নালায় পড়ে যায় এবং তার সেখানেই মৃত্যু হয়।

জানা যায়, পাদরি লোকটি প্রথমে খ্রিষ্টান ছিল। পরে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। কিছুদিন মুসলমান ছিল। কিন্তু পরে আবার সে ইসলামধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং ইসলাম, মুসলমান ও কুরআন নিয়ে মানুষের মধ্যে মিথ্যা ছড়াতে থাকে। নির্মম মৃত্যুর মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে।

এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এর জন্য পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরচনা প্রয়োজন। তথাপিও নবুয়তের দলিল ও প্রমাণগুলো দুটি পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ—
কুরআনের মুজিজা :

মুজিজার আভিধানিক অর্থ, অক্ষমকারী, অলৌকিক, বিস্ময়কর।

পরিভাষায় মুজিজা বলা হয়, স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়, যা কোনো মানুষের একক প্রচেষ্টা বা সকল মানুষের সমষ্টিগত প্রচেষ্টাতেও করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা নবুয়তের জন্য যাকে মনোনীত করেন, তার হাতে মুজিজা সংঘটিত করে থাকেন। যেন এটি তার রিসালাত ও নবুয়তের সত্যায়নকারী হয়। কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। কুরআনই হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় মুজিজা। হাজার বছর ধরে এই মুজিজা অক্ষত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত থাকবে। এর মাঝে সামান্যও পরিবর্তন কেউ সাধন করতে পারবে না। এই কুরআন পূর্বেকার সকল ধর্ম রহিত করে দিয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত যত বাতিল ধর্মের আবিষ্কার হবে তাও বাতিল ঘোষণা করেছে। *সহিহ বুখারিতে* বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

প্রত্যেক নবীকে তার যুগের প্রয়োজন অনুসারে কিছু মুজিজা প্রদান করা হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তার প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে মুজিজা দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে ওহি, যা আল্লাহ আমার প্রতি অবতীর্ণ

করেছেন। কাজেই আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের অনুপাতে আমার অনুসারীদের সংখ্যা অধিক হবে।[৯৪]

এই হাদিস দ্বারা এটি উদ্দেশ্য নয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিজা মাত্র কুরআন কারিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ, বরং এর উদ্দেশ্য হলো, কুরআন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় মুজিজা। বিশেষ মুজিজা, যার অধিকারী একমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অন্য কেউ নয়। কারণ, প্রত্যেক নবীকেই বিশেষ একটি মুজিজা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি তার স্বজাতির লোকদের চ্যালেঞ্জ করতেন। আর প্রত্যেক নবীকেই তার সম্প্রদায়ের অবস্থার সঙ্গে মিল রেখে মুজিজা দেওয়া হয়েছে। যেমন মিশরে ফেরআউন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাদুর ব্যাপক ছড়াছড়ি ছিল। তাদের নবী মুসা আ. মুজিজাস্বরূপ একটি লাঠি নিয়ে এলেন যা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল এক সাপ হয়ে যায় এবং জাদুকরদের বানানো সকল সাপকে গিলে ফেলে। এই জাদুর মুজিজা মুসা আ. ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহ তাআলা দেননি। এটি ছিল মুসা আ.-এর বিশেষ মুজিজা। যখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যাপক ছড়াছড়ি ছিল, তখন ঈসা আ. তাদের মধ্যে এমন মুজিজা নিয়ে এলেন, যাতে সে কালের সকল ডাক্তার হয়রান ও পেরেশান হয়ে গেল। তিনি তার মুজিজার মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করে তোলেন। এই দেখে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বড় বড় ডাক্তার দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়ে। তারা স্বীকার করে নেয় যে, ঈসা আ. যা করছেন তা চিকিৎসাবিজ্ঞানের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। মুজিজা দেখে তারা ঈসা আ.-এর সত্য নবী হওয়ার প্রমাণ পায়।

আরবে যখন শিল্প-সাহিত্য ও ভাষাজ্ঞানের প্রাচুর্য, লোকদের মাঝে কবি ও সাহিত্যিকদের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত, তখন আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও ভাষাজ্ঞানের অধিকারী করে পাঠালেন। মুজিজাস্বরূপ তার কাছে প্রেরণ করলেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, যা সমগ্র আরবের কিংবদন্তিতুল্য কবি-সাহিত্যিকদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলো। কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেন—

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

৯৪ সহিহ বুখারি, ৪৯৮১।

এতে মিথ্যা আসতে পারে না, না তার সামনে থেকে এবং না তার পেছন থেকে। এটি এক প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।[৯৫]

কিন্তু কুরআনের মুজিজা অন্য সকল মুজিজা থেকে ভিন্ন। এটি কিয়ামত পর্যন্ত রাসুলের মুজিজা হিসেবে অক্ষত থাকবে। অন্যান্য নবীর মুজিজা তাদের নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত টিকে ছিল। তাদের ইনতিকালের পর সেগুলো মাত্র সত্য সংবাদ হিসেবে বাকি আছে। কিন্তু কুরআন যেমনইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় বাকি ছিল, তেমনইভাবে তার ইনতিকালের পর আজ অবধি এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগে বাকি থাকবে। এই কুরআন যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে, তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি আশা করি কিয়ামতের দিন সকল নবীর চেয়ে আমার উম্মত বেশি হবে।'

কুরআন একটি স্পষ্ট নিদর্শন। কুরআন অনেক দিক থেকেই মুজিজা। যেমন শব্দের দিক থেকে, বাক্যের অন্ত্যমিলের দিক থেকে, অলংকারশাস্ত্রের দিক থেকে, অর্থের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা এবং ফিরিশতাদের বিবরণসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুরআন এক জীবন্ত মুজিজা। কুরআন মুজিজা হওয়ার ব্যাপারে বিশাল বিশাল অনেক গ্রন্থরচনা হয়েছে। সেখানে প্রতিটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই ছোট্ট পুস্তিকায় সেসব আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি এখানে উদাহরণস্বরূপ চারটি মুজিজা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

এক. কুরআনের বর্ণনা ও আলংকারিক মুজিজা :

কুরআনের প্রতিটা বর্ণনা, অর্থোপযোগী শব্দপ্রয়োগ, বাক্যগঠন, বাক্যের অন্ত্যমিলসহ প্রতিটি বিষয় এতটাই নিখুঁত যে, কোনো মানুষের পক্ষে তা রচনা করা সম্ভব না। বরং আল্লাহ তাআলা সকল মানুষ ও জিনজাতিকে এর রচনা করার চ্যালেঞ্জ করেছেন। এতে তারা ব্যর্থ ও অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

---

৯৫ সুরা ফুসসিলাত, ৪২।

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.

বলুন, যদি মানব ও জিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনার জন্য জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও রচনা করতে পারবে না।[৯৬]

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মানুষ যখন কুরআনের মতো অন্য কোনো কিতাব রচনা করতে ব্যর্থ হলো, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আবার চ্যালেঞ্জ করলেন যে, তারা যেন কুরআনের মতো মাত্র দশটি সুরা রচনা করে। ইরশাদ হয়েছে—

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

নাকি তারা বলে যে, এই কুরআন সে (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে বানিয়েছে? বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরাও তার অনুরূপ দশটি সুরা বানিয়ে আনো এবং এ কাজে সাহায্যের জন্য আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডেকে নাও।[৯৭]

তারা এতেও ব্যর্থ হলে আল্লাহ তাআলা আরও সহজ করে বলেন—

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দিন, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সুরা, আর ডেকে নাও যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।[৯৮]

এর মাধ্যমে কুরআনের মুজিজার সামনে সকল সৃষ্টির ব্যর্থতার সংবাদ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন যে, তারা সকলেও যদি একত্রিত হয়, তবুও এই কুরআনের

---

৯৬ সুরা বনি ইসরাইল, ৮৮।

৯৭ সুরা হুদ, ১৩।

৯৮ সুরা ইউনুস, ৩৮।

অনুরূপ নিয়ে আসতে পারবে না। এমনকি তারা সকলে মিলে একে অপরকে সাহায্য করলেও কুরআনের অনুরূপ একটি সুরা বা আয়াত তারা রচনা করতে সক্ষম হবে না। এই চ্যালেঞ্জ সমগ্র সৃষ্টির প্রতি। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে আজ অবধি যারাই কুরআন শ্রবণ করেছে, তারাই এই চ্যালেঞ্জের কথা শুনেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেনি। এই কুরআনে শুধু সাহিত্যের দিক থেকেই হাজারটা মুজিজা রয়েছে। কারণ, কুরআনে একশ চৌদ্দটি সুরা রয়েছে। আর কুরআন চ্যালেঞ্জ করেছে মাত্র একটি সুরা রচনা করতে। কুরআনের সবচেয়ে ছোট সুরা হলো সুরা কাউসার। মাত্র তিনটি আয়াত। সকলের ঐকমত্যে কুরআনে আয়াত রয়েছে ছয় হাজার দুইশর কিছু বেশি। সুরা কাউসার কুরআনের অন্য অনেক আয়াতের চেয়েও ছোট। কুরআন চ্যালেঞ্জ করেছে এই ছোট সুরার মতো একটি সুরা হলেও তারা যেন নিজেদের থেকে রচনা করে দেখায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সফল হতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না।

দুই. অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রদান :

কুরআনের মুজিজার আরেকটি দিক হলো, কুরআনে এমন অনেক অদৃশ্যের সংবাদ রয়েছে, যে সম্পর্কে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো জ্ঞান ছিল না এবং কোনো মানুষের পক্ষেও তা জানা সম্ভব ছিল না। এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, নিঃসন্দেহে কুরআন হলো আল্লাহর কালাম। আর আল্লাহ তাআলার নিকট কোনোকিছুই গোপন নেই। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে—

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.

তার কাছেই অদৃশ্যজগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোনো পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন। কোনো শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোনো আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না, এ সবকিছু প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে।[৯৯]

---

৯৯ সুরা আনআম, ৫৯।

অদৃশ্যের সংবাদ অনেক প্রকার। যেমন—

- অতীতের অজানা সংবাদ দেওয়া বা বিভিন্ন অজানা ঘটনা বর্ণনা করা। যেমন আদ, সামুদসহ কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন জাতির ঘটনা।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামসময়িক বিভিন্ন অজানা বিষয়ের সংবাদ প্রদান করে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়া। যেমন মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে এবং মুসলমানদের গোপন বিভিন্ন অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তার রাসুলকে জানিয়েছেন। এ ছাড়া আরও অনেক বিষয় যা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউ জানত না। সেগুলো আল্লাহ তাআলা তার রাসুলকে জানিয়েছেন।
- ভবিষ্যতের গোপন বিষয়। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন অনেক বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন যা তখনও ঘটেনি। কিন্তু পরে তিনি ঠিক যেভাবে সংবাদ দিয়েছেন বিষয়টি সেভাবেই ঘটেছে। সুতরাং এই বিষয়গুলোই প্রমাণ করে যে, এই কুরআন আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ তাআলার সত্য রাসুল।

তিন. আইন বা বিধান সম্পর্কিত মুজিজা :

কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ হিদায়াতস্বরূপ। সর্বকালে, সকল স্থানে সমস্ত মানুষের প্রয়োজন পুরা করার জন্য সংবিধান হলো এই কুরআন। এই কুরআন আল্লাহর দেওয়া মানুষের জীবন পরিচালনার গাইডলাইন। আল্লাহ তাআলা হলেন সকলকিছুর স্রষ্টা। তিনি সকল জিনিসের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত। মানবজাতির কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন। তিনি জানেন কোন জিনিসটা মানবজাতির জন্য উপকারী আর কোন জিনিসটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। তাই তিনি যখন কোনো আদেশ বা হুকুম জারি করেন, তা হয় পূর্ণ কল্যাণ ও হিকমতপূর্ণ। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে কুরআনে—

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? জেনে রাখো, তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।[১০০]

আমরা যদি বর্তমানে মানবরচিত বিধান এবং সংবিধানের দিকে লক্ষ করি, তাহলে বিষয়টি আমাদের সামনে আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, মানবরচিত বিধানগুলো মানুষের সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এই বিধানগুলো কখনোই মানুষের সমস্যার সঠিক সমাধান করতে পারেনি। ফলে প্রতিনিয়ত তার মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হচ্ছে। আজ যেটাকে বিধান হিসেবে গ্রহণ করছে, কালই তা অচল হয়ে যাচ্ছে। ফলে তা পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে এবং বাতিল করা হয়। এরপরও কি মানুষের সমস্যার সঠিক কোনো সমাধান তারা করতে পারছে? মানুষের সমস্যার সমাধান করবে তো দূরের কথা, বরং মানুষ আরও বেশি দুর্ভোগ ও নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

এর কারণ হলো মানুষের মেধা দুর্বল, সে ভুলকারী, বিস্মৃতিপ্রবণ, তার বিবেচনা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, সমস্যাগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে না, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞ, সে জানে না আগামীকাল কী ঘটবে, সামনে মানুষের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন আসবে সে বিষয়ে সামান্য ধারণা তার নেই। মানবরচিত আইন ও সংবিধান যে মানুষের সমস্যার সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ এই কথা বর্তমানে আমাদের চেয়ে আর কে ভালো বলতে পারবে। কিন্তু কুরআন এই ধরনের সকল দোষ ও অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পূতপবিত্র। কুরআন সর্বকালে এবং সকল স্থানে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণের জিম্মাদার। কুরআন মানুষের সমস্যা সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানবজাতি যখন কুরআনকে শক্তভাবে আকড়ে ধরবে, তখন তাদের থেকে সকলপ্রকার সমস্যা দূর হবে এবং জুলুম, নির্যাতন ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনার সকল আঁধার কেটে ন্যায়-ইনসাফ ও শান্তিশৃঙ্খলার আলো ফুটবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.

---

১০০ সুরা মুলক, ১৪।

এই কুরআন এমন পথপ্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।[১০১]

মোটকথা, কুরআনের বিধিবিধান বিশেষ তিন প্রকার কল্যাণের সমষ্টি।

প্রথম প্রকার : এই ছয়টি জিনিস থেকে অকল্যাণ ও অনিষ্ট দূর করে, ১. দ্বীনের সংরক্ষণ। ২. ব্যক্তির সংরক্ষণ। ৩. মস্তিষ্ক বা চিন্তা-চেতনার সংরক্ষণ। ৪. মানুষের নসব তথা বংশধারা সংরক্ষণ। ৫. সম্মান ও ইজ্জতের সংরক্ষণ। ৬. সম্পদের সংরক্ষণ।

দ্বিতীয় প্রকার : কল্যাণ অর্জন করা। কুরআনে কারিম সকল কল্যাণের পথকে খুলে দিয়েছে এবং অকল্যাণের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

তৃতীয় প্রকার : মানুষকে উত্তম চরিত্র এবং সুন্দর অভ্যাসের ওপর পরিচালিত করা। কুরআনে কারিম মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত এমনসব সমস্যার সমাধান দিয়েছে, মানুষের পক্ষে যার সমাধান-আবিষ্কার সম্ভব হয়নি। মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণলাভের এমন কোনো দিক নেই যার মূলনীতি কুরআনে বর্ণিত হয়নি।

চার. আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কিত মুজিজা :

কুরআনের মুজিজার এটি অনেক বড় একটি দিক যে, কুরআন ভবিষ্যতের এমন অনেক বিষয়ের সংবাদ দিয়েছে যা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে আমাদের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে। যেমন দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, ফলে তাদের কাছে ফুটে

---

১০১ সুরা বনি ইসরাইল, ৯।

উঠবে, এ কুরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?[১০২]

কুরআনে আল্লাহ তাআলা হাজার বছর পূর্বে যে-সমস্ত বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, মানুষ আজ তা প্রত্যক্ষ করছে। কুরআন ব্যতীত আর কোথাও এর আগাম ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়নি। মানুষ বর্তমানে বিমান, রকেট, জাহাজসহ আরও অনেক আশ্চর্য বস্তু আবিষ্কার করছে, যার ধারণা কিছুকাল আগেও মানুষের ছিল না। তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এসবের সংবাদ কে দিলো দেড় হাজার বছর পূর্বে? সুতরাং এগুলোই প্রমাণ করে যে, এই কুরআন আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহর সত্য রাসুল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—অনুভূতিসংক্রান্ত মুজিজা :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত এমন অনেক মুজিজা প্রকাশ পেয়েছে, যা সচরাচর সংঘটিত হয় না। এ জাতীয় মুজিজার পরিমাণ অনেক, যার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া এই ছোট্ট পুস্তিকায় সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে এর থেকে সাত প্রকারের মুজিজার কথা উদাহরণস্বরূপ পেশ করছি।

প্রথম প্রকার—উর্ধ্বজাগতিক মুজিজা :

এক. ইসরা ও মিরাজ। ইসরা ও মিরাজের রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত আসমানের ওপর আরোহণ করেছেন। কুরআনে কারিমে এই বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা আছে এবং মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত। কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন—

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলা ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাকে

---

১০২ সুরা ফুসসিলাত, ৫৩।

কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।[১০৩]

এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম বড় একটি মুজিজা। এই রাতে তাকে মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বিশাল দূরত্ব মুহূর্তের মধ্যেই অতিক্রম করে যান। এরপর সেখান থেকে তাকে আসমানের ওপর আরোহণ করানো হয়। এমন এক স্থান পর্যন্ত তাকে নিয়ে পৌছা হয় যেখান থেকে তিনি লাওহে মাহফুজের লেখার কলমের খস্খস্ শব্দ শুনতে পান। তিনি জান্নাত প্রত্যক্ষ করেন এবং এই সময় নামাজ ফরজ করা হয়। অতঃপর সকাল হওয়ার পূর্বেই আবার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। কুরাইশরা এই ঘটনাকে মিথ্যা ও অবাস্তব বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। ঘটনার সত্যতার পক্ষে প্রমাণস্বরূপ তারা বাইতুল মাকদিসের বিবরণ জানতে চায়। কারণ তারা জানত, তিনি এর পূর্বে কখনো বাইতুল মাকদিস দেখেননি। তারা ভেবেছিল, তাদের এই প্রশ্নে বুঝি রাসুল ধরা পড়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা তখন আরেকটি মুজিজার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন। রাসুলের সামনে গোটা বাইতুল মাকদিসের চিত্র তুলে ধরলেন। কুরাইশের ধূর্ত লোকদের করা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তিনি দেখে দেখে দিতে থাকেন।

দুই. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ। নবুয়তের প্রমাণের ক্ষেত্রে এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি মুজিজা। মক্কাবাসী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার নবুয়তের সত্যতার পক্ষে একটি নিদর্শন দেখাতে বলল। রাসুল তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন। তখন তারা স্পষ্টভাবে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত দেখতে পেয়েছে। এমনকি তারা হেরা পর্বতকে মাঝখানে এবং চাঁদের দুই টুকরা তার দুই পাশে দেখেছে। কুরআনে কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন—

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ.

কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু।[১০৪]

---

১০৩ সুরা বনি ইসরাইল, ১।
১০৪ সুরা কমার, ১-২।

দ্বিতীয় প্রকার—বায়ুমণ্ডল ও আবহাওয়ার নিদর্শন :

এক. এই মুজিজার একটি হলো, আল্লাহর আদেশে আকাশের মেঘমালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করত। অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর বরকতে বৃষ্টি নামত, আবার তার দুআর বরকতে বৃষ্টি বন্ধ হতো।

দুই. আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাতাসের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। যেমন কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا.

হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না।[১০৫]

এটি হলো পূর্ব দিক থেকে আসা বাতাস। আল্লাহ তাআলা তা সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। এই সম্পর্কে হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে সবা তথা পূবালি বাতাসের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে। আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে দাবুর তথা পশ্চিমা বাতাসের মাধ্যমে।'[১০৬]

তৃতীয় প্রকার—মানবজাতি, জিনজাতি এবং প্রাণিকুলের মধ্যে কর্তৃত্ব প্রয়োগ :

এর আলোচনা বেশ দীর্ঘ। বিস্তারিত আলোচনা না করে বরং উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি দিক উল্লেখ করছি।

---

১০৫ সুরা আহযাব, ৯।
১০৬ সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইসতিসকা, ১/৬১৬।

এক. মানুষের মধ্যে তার কর্তৃত্ব প্রয়োগের দৃষ্টান্ত যেমন—

- আলি ইবনে আবু তালিব রা. একবার চোখের বেদনায় আক্রান্ত হলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-এর চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দুআ করলেন। ফলে তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন তার চোখে কখনো কোনো ব্যথাই ছিল না।[১০৭]
- আবদুল্লাহ ইবনে আতিক রা.-এর পায়ের নলা ভেঙে গিয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে হাত বুলিয়ে দিলে তা এমনভাবে ভালো হয়ে গেল, যেন তার পা কখনো ভাঙেইনি।[১০৮]
- খাইবারের যুদ্ধের দিন সালামা ইবনে আকওয়া রা. পায়ে আঘাত পেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পায়ে তিনবার ফুঁ দিয়ে দিলে তা ভালো হয়ে যায়। পরে তিনি আর কোনো ব্যথা অনুভব করেননি।[১০৯]

দুই. জিন ও শয়তানের ওপর তার প্রভাব :

- কেউ জিন বা শয়তানের মাধ্যমে আক্রান্ত হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উদ্দেশ করে শুধু এতটুকু বলতেন যে, أخرج عدو الله أنا رسول الله—'হে আল্লাহর দুশমন! আমি আল্লাহর রাসুল বলছি, তুই বের হয়ে যা।' এতে জিন বা শয়তান দূরে চলে যেত।[১১০]
- উসমান ইবনে আবুল আস রা. জিনে আক্রান্ত হলে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত দিয়ে তার বুকের ওপর তিনবার আঘাত করে বলেন, হে আল্লাহর দুশমন! বের হয়ে যা। ফলে তার থেকে শয়তান এমনভাবে পলায়ন করল যে, এরপর আর কখনো তাকে আক্রান্ত করেনি।[১১১]

---

১০৭ সহিহ বুখারি, কিতাবুল জিহাদ, ৬/১৪৪; মুসলিম, ৪/১৮৭২।
১০৮ সহিহ বুখারি; কিতাবুল মাগাজি (ফাতহুল বারি), ৭/৩৪০।
১০৯ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৭/৪৭৫।
১১০ মুসনাদে আহমদ, ৪/১৭০, ১৭২।
১১১ সুনানে ইবনে মাজাহ, ২/১১৭৪।

তিন. প্রাণিকুলের ওপর তার কর্তৃত্ব :

প্রাণীর ওপর কর্তৃত্বের মুজিজার ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ কেবল একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

একবার এক উট এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিজদা করল। সাহাবায়ে কেরাম রা. এ দেখে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গাছগাছালি ও প্রাণীরা আপনাকে সিজদা করে। তাহলে আমরা তো আপনাকে সিজদা করার ব্যাপারে অধিক হক রাখি।' তাদের কথার প্রত্যুত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো এবং তোমাদের ভাইকে সম্মান করো। আমি যদি কাউকে সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম স্বামীকে সিজদা করতে।'[১১২]

চতুর্থ প্রকার—গাছগাছালি, ফলফলাদি এবং কাঠের ওপর তার প্রভাব:

এক. গাছগাছালির ওপর তার প্রভাব :

- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এক সফরে ছিলেন, তার নিকট এক বেদুইন এলো। তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। বেদুইন লোকটি বলল, 'আপনি যা বলছেন, তা যে সত্য এর সাক্ষ্য কে দেবে?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এই গাছ।' তারপর তিনি গাছটিকে ডাকলেন। গাছটি ছিল উপত্যকার এক পাশে। তখন জমি ফেড়ে গাছটি তার সামনে এসে দাঁড়াল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাছকে সাক্ষ্য দিতে বললেন। অমনি গাছ রাসুলের কথানুযায়ী তিনবার সাক্ষ্য দিলো। সাক্ষ্য দিয়ে গাছ তার নিজ স্থানে ফিরে গেল।[১১৩]
- জাবির রা. বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমরা চলছিলাম। চলতে চলতে আমরা একটি প্রশস্ত উপত্যকায় অবতরণ করলাম। এই সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শৌচকার্য সম্পন্নের জন্য একাকী নির্জন স্থানের দিকে

১১২ মুসনাদে আহমদ, ৬/৭৬।
১১৩ সুনানে দারামি, ১/১৭।

এগিয়ে গেলেন। আমি বিষয়টি বুঝতে পেরে পানির পাত্র নিয়ে রাসুলের পেছনে পেছনে যাই। তিনি চারদিকে তাকিয়ে নিজেকে আড়াল করার মতো কিছু পাননি। হঠাৎ উপত্যকার এক প্রান্তে দুটি বৃক্ষ দেখতে পেলেন। তিনি একটি বৃক্ষের কাছে গেলেন এবং তার ডাল হাতে নিয়ে বললেন, 'আল্লাহর হুকুমে তুমি আমার আনুগত্য করো।' ডাল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বশ্যতা স্বীকার করে নিল, লাগাম পরিহিত ওই উটের ন্যায় যা তার চালকের অনুসরণ করে। তারপর রাসুল দ্বিতীয় গাছটির কাছে এসে তার একটি ডাল হাতে নিয়ে বললেন, 'আল্লাহর হুকুমে তুমি আমার আনুগত্য করো।' এটিও অনুরূপ তার আনুগত্য করল। তারপর দুই গাছের মাঝখানে গিয়ে তিনি দুটি ডাল একসঙ্গে মিলিয়ে বললেন, 'আল্লাহর হুকুমে তোমরা আমার সম্মুখে একত্রিত হয়ে মিলে যাও।' তৎক্ষণাৎ ডাল দুটি একত্রিত হয়ে গেল। জাবির রা. বলেন, অতঃপর আমি এই ভয়ে দৌড়ে চলে এলাম যে, না জানি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি তার সন্নিকটে হওয়ার বিষয়টি জেনে ফেলেন এবং আরও দূরে চলে যান।[১১৪]

দুই. ফলফলাদির মধ্যে তার প্রভাব :

এক বেদুইন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি কীভাবে বুঝব যে, আপনি নবী? তিনি বললেন, আমি যদি এই খেজুরগাছের কাঁদিকে এখানে আসতে বলি তাহলে কি তুমি আমাকে আল্লাহর রাসুল বলে সাক্ষ্য দেবে? রাসুল খেজুরের কাঁদিটিকে ডাকলেন। অমনি সেটি গাছ থেকে নেমে রাসুলের সামনে এসে দাঁড়াল। এরপর বললেন, 'ফিরে যাও।' সেটি ফিরে গেল। বেদুইন এই ঘটনা দেখে মুসলমান হয়ে গেল।[১১৫]

তিন. কাঠের মধ্যে তার প্রভাব :

মদিনায় মসজিদে নববিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুআর দিন খেজুরগাছের একটি কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। দীর্ঘ সময় এভাবেই চলছিল। তারপর একদিন খেজুরগাছের কাঠের পরিবর্তে মিম্বর বানানো হলো। রাসুল খুতবা প্রদানের জন্য মিম্বরে আরোহণ করলেন। এই সময় খেজুরগাছের

---

১১৪ সহিহ মুসলিম, ৪/২৩০৬।

১১৫ সুনানে তিরমিজি, ৫/৫৯৪; মুসনাদে আহমদ, ১/১২৩।

কাঠটি বাচ্চাদের মতো কান্না করতে লাগল। সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে রাসুল কাঠটি ধরে নিজের দিকে টান দিলেন এবং হাত বুলিয়ে দিলেন। কাঠ শান্ত হয়ে গেল।[১১৬]

পঞ্চম প্রকার—পাহাড় ও পাথরে তার প্রভাব :

এক. পাহাড়ে তার প্রভাব :

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন উহুদ পাহাড়ের ওপর আরোহণ করলেন। এই সময় তার সঙ্গে ছিলেন প্রিয় সাহাবি আবু বকর, উমর ও উসমান রা.। তখন হঠাৎ পাহাড় কেঁপে উঠল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে আঘাত করে বললেন, 'হে উহুদ! স্থির হও। তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং দুইজন শহিদ রয়েছে।'[১১৭]

দুই. পাথরে তার প্রভাব :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমি মক্কার এমন একটি পাথরকে চিনি, নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে যেটা আমাকে সালাম করেছিল। অবশ্যই আমি তাকে এখনো চিনি।'[১১৮]

তিন. মাটির মধ্যে তার প্রভাব :

হুনাইনের দিন, যুদ্ধ যখন কঠিন আকার ধারণ করল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাহন থেকে নেমে জমিন থেকে একমুঠো মাটি হাতে নিলেন। অতঃপর কাফিরদের দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, 'তোদের মুখমণ্ডল কুৎসিত হোক।' (অর্থাৎ, তোরা ধ্বংস হয়ে যা।) এই বলে হাতের মাটি ওদের দিকে ছুড়ে মারলেন। সকলের চোখে সেই মাটি আঘাত হানল, একজনও বাদ ছিল না। আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করলেন এবং তাদের সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।[১১৯]

---

১১৬ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৬/৬০২; মুসনাদে আহমদ, ১/১০৯।
১১৭ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৭/২২, ৫৩।
১১৮ সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফাজায়িল, ৪/১৭৮২।
১১৯ সহিহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, ৩/১৪০২।

ষষ্ঠ প্রকার—পানি প্রবাহিত করা, খাবার, পানি এবং ফল বৃদ্ধি পাওয়া:

এক. পানি প্রবাহিত ও বৃদ্ধি হওয়া :

এ জাতীয় বিষয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেক অনেক প্রকাশ পেয়েছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

- হুদাইবিয়ার দিন মুসলিম বাহিনী প্রচণ্ড পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট পাত্রের মধ্যে তার হাত রাখলেন। আর অমনি তার আঙুলের মাঝখান থেকে ঝরনার মতো পানি প্রবাহিত হতে লাগল। সে পানি থেকে সকলে পান করল এবং অজু করল। জাবের রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনারা তখন কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, আমরা যদি এক লক্ষ থাকতাম তথাপিও তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। সেদিন আমরা ছিলাম পনেরোশ।[১২০]
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুকে পৌছলেন, তখন সেখানে জুতার ফিতার মতো চিকন নালায় প্রবাহিত একটি ঝরনা পেলেন। সেখান থেকে হাতে করে অল্প অল্প পানি ওঠানো হলো। এভাবে কিছু পানি জমা হলো। এই দিয়ে রাসুল তার হাত ও চেহারা ধৌত করলেন। তারপর পানিগুলো পুনরায় ঝরনার মাঝে ফিরিয়ে দিলেন। রাসুলের ব্যবহৃত সেই পানি ঝরনায় ফেলার পর সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। বর্ণনাকারী বলেন, আজও সেই ঝরনাটি বিদ্যমান রয়েছে।[১২১]

দুই. খাবার বৃদ্ধি হওয়া :

- এক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী ক্ষুৎপিপাসায় বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ। খাবার ছিল একেবারেই সামান্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট যত খাবার আছে তা একত্র করে একটি দস্তরখানে রাখার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ তাআলা

---

১২০ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৬/৫৮১, ৭/৪৪১, ১০/১০১; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, ৩/১৪৮৪।

১২১ সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফাজায়িল, ৪/১৭৮৪।

তাতে অনেক বরকত দিলেন। ফলে বাহিনীতে উপস্থিত সকল যোদ্ধা সেখান থেকে তৃপ্তিভরে আহার করলেন।

- খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবিগণ তিন দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকেন। সঙ্গীদের ক্ষুধা ও অসহায়ত্ব দেখে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. একটি বকরির বাচ্চা জবাই করলেন। আর তার স্ত্রী অল্প কিছু জবের রুটি বানালেন। তার ইচ্ছা ছিল এর মাধ্যমে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমানদারি করবেন। ভাবনা অনুযায়ী তিনি রাসুলকে দাওয়াত দিলেন। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা না এসে সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। খাবারের পরিমাণ অল্প দেখে তিনি তাতে থুথু ছিটিয়ে দিয়ে বরকতের দুআ করলেন। জাবের রা. বলেন, সংখ্যায় তারা ছিলেন এক হাজারের মতো। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তারা সকলে তৃপ্তিসহকারে খাবার খাওয়ার পরও খাবার যতটুকু ছিল ততটুকুই রয়ে যায়।[১২২]

তিন. শস্যদানা ও ফলফলাদিতে বরকত হওয়া :

- একবার জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে খাবার চাইল। তিনি তাকে অর্ধ ওয়াসক যব দিলেন। লোকটি, তার স্ত্রী এবং তাদের ঘরে আগত মেহমানরা তা থেকে দিনের পর দিন খেতে থাকল। পরে হঠাৎ একদিন লোকটি রাসুলের দেওয়া সে যব মেপে দেখল। মাপার পর তা স্বাভাবিক নিয়মে ফুরিয়ে গেল। তারপর সে রাসুলের নিকট অভিযোগ নিয়ে এলো। রাসুল তাকে বললেন, 'তুমি যদি সে যব না মাপতে, তবে তোমরা সেখান থেকে দিনের পর দিন খেলেও যেরূপ ছিল তেমনই থাকত।'[১২৩]
- জাবির রা. বলেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু হারাম অনেক ঋণ রেখে মারা যান। পাওনাদাররা যেন তার কিছু ঋণ ছেড়ে দেয়, এজন্য আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্য চাইলাম। রাসুল পাওনাদারদের কিছু ঋণ ছেড়ে দিতে বললে তারা তাতে রাজি হয় না। রাসুল আমাকে বললেন, 'যাও, তোমার

---

১২২ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৭/৩৯৫।
১২৩ সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফাজায়িল, ৪/১৭৮৪।

প্রত্যেক ধরনের খেজুরকে আলাদা আলাদা করে রাখো। পরে আমাকে খবর দিয়ো।' রাসুলের কথানুযায়ী আমি তাই করলাম। তিনি এসে খেজুরের ওপরে বা তার মাঝখানে বসলেন। তারপর বললেন, 'প্রত্যেক পাওনাদারকে এখান থেকে মেপে দাও।' আমি তাদের মেপে দিতে লাগলাম। দিতে দিতে সকলের পাওনা পুরোপুরি দিয়ে দিলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আমার খেজুর সামান্যও কমেনি। যেমন ছিল ঠিক তেমনই রয়ে গেল।[১২৪]

সপ্তম প্রকার—ফিরিশতাদের মাধ্যমে নুসরত ও সাহায্য করা :

আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার দ্বীনকে বিজয় করার জন্য বহুবার সরাসরি ফিরিশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

- হিজরতের সময় আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সরাসরি ফিরিশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

  فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

  অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখোনি। বস্তুত আল্লাহ কাফিরদের মাথা নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১২৫]

- বদরের যুদ্ধে আল্লাহ রাসুলকে আসমান থেকে ফিরিশতা প্রেরণ করে সাহায্য করেছেন। মুসলমানদের সঙ্গে ফিরিশতারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

  إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ.

---

১২৪ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৬/৫৮৭।
১২৫ সুরা তাওবা, ৪০।

তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিয়েছেন যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফিরিশতার মাধ্যমে।[১২৬]

- উহুদের যুদ্ধের দিন, জিবরাইল আ. ও মিকাইল আ. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডানে ও বামে থেকে যুদ্ধ করেছেন।[১২৭]

- খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহ রাসুলকে সাহায্য করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.

  হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।[১২৮]

- বনি কুরাইজার যুদ্ধে। খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অস্ত্র রেখে গোসল করলেন, তখন জিবরাইল আ. এসে তাকে বললেন, 'আপনি কি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? আল্লাহর শপথ, আমরা এখনো অস্ত্র রাখিনি! আপনি এখন তাদের দিকে অগ্রসর হন।' নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন দিকে?' তিনি বনি কুরাইজার দিকে ইশারা করলেন। রাসুল বনি কুরাইজার উদ্দেশে বের হলেন। আল্লাহ তাকে তাদের ওপর বিজয় দান করলেন।[১২৯]

- হুনাইনের যুদ্ধে। ইরশাদ হয়েছে—

---

১২৬ সুরা আনফাল, ৯।

১২৭ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৭/৩৫৮; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফাজায়িল, ৪/১৮০২।

১২৮ সুরা আহযাব, ৯।

১২৯ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৭/৪০৭; মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, ৩/১৩৮৯।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.

আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তখন আল্লাহ নাজিল করলেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তার রাসুল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করলেন এমন সেনাবাহিনী, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করলেন কাফিরদের, এটি হলো কাফিরদের কর্মফল।[১৩০]

অষ্টম প্রকার—আল্লাহ তাআলা রাসুলকে শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করা এবং তার জন্য যথেষ্ট হওয়া :

এটি নবুয়তের সত্যতার অনেক বড় প্রমাণ। কুরআন ও হাদিসে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা কয়েকটি উল্লেখ করছি মাত্র।

এক. আল্লাহ তাআলা তার জন্য মুশরিকদের ও ঠাট্টাকারীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ছিলেন। ফলে তারা তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। ইরশাদ হয়েছে—

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.

অতএব, আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না। বিদ্রুপকারীদের জন্য আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট।[১৩১]

---

১৩০ সুরা তাওবা, ২৬।
১৩১ সুরা হিজর, ৯৪-৯৫।

দুই. আহলে কিতাবদের ব্যাপারে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে তাকে তাদের থেকে রক্ষা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

অতএব, তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মতো, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।[১৩২]

তিন. আল্লাহ তাআলা তাকে সকল শত্রু থেকে রক্ষা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

হে রাসুল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।[১৩৩]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তার রাসুলকে সকল মানুষ থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন করেছেন। সিরাত ও ইতিহাসের পাতা মেললে এর কাঁড়ি কাঁড়ি ঘটনা আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রচলিত নিয়মের বাইরে অভিনব পদ্ধতিতে সাহায্য করেছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন এবং তাকে বিজয় দান করেছেন। যারা তার সঙ্গে শত্রুতাপোষণ করেছে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। নিম্নে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

---

১৩২ সুরা বাকারা, ১৩৭।
১৩৩ সুরা মায়িদা, ৬৭।

এক খ্রিষ্টান মুসলমান হলো। মুসলমান হওয়ার পর সে সুরা বাকারা ও আলে ইমরান পড়ল। কিছুকাল ওহি লিপিবদ্ধকারী সাহাবিদের দলেও শামিল ছিল। কিছুদিন পর সে পুনরায় মুরতাদ হয়ে খ্রিষ্টধর্মে ফিরে গেল। তখন সে বলে বেড়াত, আমি যা লিখে দিতাম তা ছাড়া মুহাম্মদ কিছুই জানে না। একদিন সে মারা গেল। লোকেরা তাকে দাফন করল। কিন্তু সকালে লোকেরা তাকে জমিনের ওপরে পড়ে থাকতে দেখল। তারা আরও গভীর করে গর্ত খুঁড়ে তাকে কবর দিলো। পরদিন সকালে যথারীতি আবারও তারা দেখতে পেল যে, জমিন তাকে মাটির ওপরে নিক্ষেপ করেছে। তারা পূর্বের চেয়ে আরও গভীর গর্ত খুঁড়ে তাকে কবর দিলো। একইভাবে পরদিন সকালে তারা পূর্বের মতোই দেখতে পেল যে, জমিন তাকে তার গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। পর পর তিন দিন একই ঘটনা অবলোকন করে লোকেরা বুঝতে পারল, এটা কোনো মানুষের কাজ নয়, বরং তার অবাধ্যতার শাস্তি। ফলে তারা তাকে সে অবস্থায় ফেলে রাখল।[১৩৪]

নবম প্রকার—দুআ কবুল হওয়া :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-সকল দুআ করেছেন, সেগুলোকে মেঘমুক্ত আকাশে ঠিক দুপুরের সূর্যের মতো পরিষ্কারভাবে কবুল হতে দেখা গেছে। এর সংখ্যা এত বেশি যে, এই ছোট্ট পুস্তিকায় সবগুলো বর্ণনার সংকলন সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করছি।

এক. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরাইরা রা.-এর মায়ের হিদায়াতের জন্য দুআ করেন। আল্লাহ তাআলা তৎক্ষণাৎ তাকে হিদায়াত দান করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান।[১৩৫]

দুই. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উরওয়া ইবনে আবুল জাদ রা.-এর জন্য দুআ করে বলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি তার ব্যবসায় বরকত দান করুন।'

---

১৩৪ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৬/৬২৪; সহিহ মুসলিম, কিতাবু সিফাতিল মুনাফিক, ৪/২১৪৫, ২৭৮১।

১৩৫ সহিহ মুসলিম, কিতাবু ফাজায়িলিস সাহাবা, ৪/১৯৩৮।

আল্লাহ তার প্রিয় রাসুলের দুআ কবুল করলেন। তিনি কুফায় থাকা অবস্থায় চল্লিশ হাজার দিনার বা দিরহাম তার লাভ হয়।[১৩৬]

তার ব্যাপারে বর্ণিত আছে, রাসুলের দুআর পর তিনি যে ব্যবসা করতেন তাতেই লাভবান হতেন। এমনকি তিনি যদি মাটি ক্রয় করতেন, তাতেও লাভবান হতেন।[১৩৭]

তিন. ইসলামের ঘৃণিত কয়েকজন শত্রুর বিরুদ্ধে বদ-দুআ করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা কবুল করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আবু জাহেল, উমাইয়া, উকবা, উতবা প্রমুখ মুশরিক নেতা।[১৩৮]

চার. বদর ও হুনাইনের দিন তার দুআ আল্লাহ কবুল করেছেন এবং মুসলমানদের সাহায্য করেছেন।

প্রকৃত জ্ঞানী ও ইনসাফের অধিকারী লোকেরা এই সকল দলিলের সামনে নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের মুখ থেকে অজান্তেই হকের এই সাক্ষ্য বের হয়ে আসবে—

أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল।

---

১৩৬ মুসনাদে আহমদ, ৪/৩৭৬।
১৩৭ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৬/৬৩২।
১৩৮ সহিহ মুসলিম, ৩/১৪১।

চতুর্থ আলোচনা—

উম্মতের ওপর রাসুল ﷺ এর হক :

এক. সত্য ও খাঁটি মনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি যা-কিছু নিয়ে এসেছেন তার ওপর ঈমান আনতে হবে। এই মর্মে কুরআনের একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

অতএব তোমরা আল্লাহ, তার রাসুল এবং অবতীর্ণ নুরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।[১৩৯]

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর ওপর, তার প্রেরিত উম্মি নবীর ওপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তার সমস্ত কালামের ওপর। তার অনুসরণ করো, যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পারো।[১৪০]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

---

১৩৯ সুরা তাগাবুন, ৮।
১৪০ সুরা আরাফ, ১৫৮।

মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তার রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি নিজে অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দেবেন, তোমাদেরকে দেবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।[১৪১]

وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.

যারা আল্লাহ ও তার রাসুলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি।[১৪২]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালিমার সাক্ষ্য দেয় এবং আমার ও আমি যা-কিছু নিয়ে এসেছি তার ওপর ঈমান আনে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো, তার নবুয়ত ও রিসালাতকে স্বীকার করা যে, তিনি মানব ও জিনজাতির নবী এবং তিনি যে রিসালাত নিয়ে এসেছেন তাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। এ ক্ষেত্রে মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি অন্তর থেকেও পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে। যখন মৌখিক স্বীকারোক্তির সঙ্গে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা হবে এবং আমলের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন ঘটানো হবে তখনই ঈমান পূর্ণতা পাবে।

দুই. রাসুলের অনুগত্য করা এবং অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনা এবং তার রিসালাতকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার পাশাপাশি তার আনুগত্য ও অনুসরণ করাও ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ.

---

১৪১ সুরা হাদিদ, ২৮।
১৪২ সুরা ফাতহ, ১৩।

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশ মান্য করো এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না।[১৪৩]

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

রাসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।[১৪৪]

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

বলুন, আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তার আনুগত্য করো, তবে সৎপথ পাবে। রাসুলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া।[১৪৫]

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এই বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।[১৪৬]

---

১৪৩ সুরা আনফাল, ২০।
১৪৪ সুরা হাশর, ৭।
১৪৫ সুরা নুর, ৫৪।
১৪৬ সুরা নুর, ৬৩।

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

যে-কেউ আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।[১৪৭]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.

আল্লাহ ও তার রাসুল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।[১৪৮]

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

যে-কেউ আল্লাহ ও রাসুলের আদেশমতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য। যে-কেউ আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।[১৪৯]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে আমার অনুগত্য করল সে আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল, আর যে আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহ তাআলারই অবাধ্য হলো।’[১৫০]

---

১৪৭ সুরা আহযাব, ৭১।
১৪৮ সুরা আহযাব, ৩৬।
১৪৯ সুরা নিসা, ১৩-১৪।
১৫০ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১৩/১১১, হাদিস ৭১৩৭।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে অস্বীকারকারী ব্যতীত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।' সাহাবিগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! কারা আপনার অস্বীকারকারী?' তিনি বললেন, 'যারা আমার আনুগত্য করে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা আমার অবাধ্য হবে, সেই আমাকে অস্বীকার করল।'[১৫১]

তিন. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আইডল ও আইকন বানানো। সর্বক্ষেত্রে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করা। ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।[১৫২]

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।[১৫৩]

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

বলে দিন, হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের সকলের প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, সমগ্র আসমান ও জমিনে যার রাজত্ব। একমাত্র তাকে

---

১৫১ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১৩/২৪৯, হাদিস ৭২৮০।
১৫২ সুরা আলে ইমরান, ৩১।
১৫৩ সুরা আহযাব, ২১।

ছাড়া আর কারও উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যুদান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর ওপর, তার প্রেরিত উম্মি নবীর ওপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ ও তার সমস্ত কালামের ওপর। তার অনুসরণ করো, যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পারো।[১৫৪]

উল্লিখিত আয়াত থেকে এই কথা স্পষ্ট হয় যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। কোনো বিষয়েই তার অবাধ্য হওয়া যাবে না। যেমনটি এক হাদিসে তিনি বলেছেন, 'যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার উম্মত নয়।'[১৫৫]

চার. নিজের জানমাল, পরিবার-পরিজন এবং দুনিয়ার সকলকিছুর চেয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান—যাকে তোমরা পছন্দ করো—আল্লাহ, তার রাসুল ও তার পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।[১৫৬]

হাদিসে এসেছে, আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার

---

১৫৪ সুরা আরাফ, ১৫৮।
১৫৫ সহিহ বুখারি, ৫০৬৩; ফাতহুল বারি, ৯/১০৪।
১৫৬ সুরা তাওবা, ২৪।

হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তান, মাতাপিতা এবং সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় হব।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসার বড় একটি পুরস্কার হলো, জান্নাতে রাসুলের সঙ্গী হওয়া। এটি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। *সহিহ বুখারি* ও *মুসলিম*-এ বর্ণিত আছে, একবার এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জান্নাত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'তুমি জান্নাতের জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?' লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি বেশি বেশি সিয়াম পালন, সালাত আদায় এবং সদকা প্রদানের মাধ্যমে প্রস্তুতি নিতে পারিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসি।' রাসুল তাকে বললেন, 'তুমি যাকে ভালোবাসো, কিয়ামতের দিন তার সঙ্গেই থাকবে।'[১৫৭]

আনাস রা. বলেন, আমরা ইসলাম গ্রহণের পর এতটা খুশি হইনি যতটা খুশি হয়েছিলাম রাসুলের এই কথা শোনার পর। কারণ আমিও আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসি, ভালোবাসি আবু বকর, উমর রা.-কে। সুতরাং আমি আশা করি, আখিরাতে আমি তাদের সঙ্গী হব, যদিও আমার আমল তাদের মতো নয়।[১৫৮]

*সহিহ বুখারি*তে আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন উমর ইবনু খাত্তাব রা.-এর হাত ধরেছিলেন। উমর রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।' রাসুল বললেন, 'না, ওই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! যতক্ষণ আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় না হব তোমার ঈমান পূর্ণ হবে না।' তারপর উমর রা. বলেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়।' রাসুল বললেন, 'উমর! এখন তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে।'[১৫৯]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক লোক এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি এমন লোকের ব্যাপারে কী বলেন, যে কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসে

---

১৫৭ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১০/৫৫৭; সহিহ মুসলিম, ২০৩২।
১৫৮ সহিহ মুসলিম, ২০৩২।
১৫৯ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১১/৫২৩।

কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলিত হয় না?' তিনি বললেন, 'মানুষ যাকে ভালোবাসে তার সঙ্গেই থাকবে।'[১৬০]

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তলিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলকে বলতে শুনেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসুল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে, সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করেছে।'[১৬১]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকবে, সে প্রকৃত ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে। এক. আল্লাহ ও তার রাসুল যার কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয় হবে। দুই. কোনো মানুষকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসবে। তিন. আল্লাহ তাআলা তাকে কুফর থেকে উদ্ধার করার পর (অর্থাৎ, ঈমান আনার পর) পুনরায় কুফরে ফিরে যাওয়াকে নিজের জন্য ততটাই অপছন্দ করবে, যতটা অপছন্দ করে সে নিজেকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করতে।'[১৬২]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা যাকে এই তাওফিক দিয়েছেন, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারে। সে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্যে নিজেকে পরিপূর্ণ সঁপে দেয় এবং এর জন্য সকলপ্রকার কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারপর সে কেবল ওই পথেই চলে, যে পথ আল্লাহর রাসুলের নির্দেশিত। কেননা রাসুলকে ভালোবাসার দাবি হচ্ছে তার পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। রাসুল যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। ভালোবাসার দাবি এটাই। প্রেমাস্পদের অনুসরণ ও অনুকরণে নিজেকে অভ্যস্ত করা। কবি বড় চমৎকার বলেছেন, তুমি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করো, কিন্তু তার অনুসরণ করো না। শপথ করে বলছি তুমি মিথ্যাবাদী। ভালোবাসার দাবিতে তুমি যদি সত্যবাদী হতে, তাহলে অবশ্যই তার আনুগত্য করতে। সত্যিকার প্রেমিক তো সে, যে তার পেমাস্পদের অনুসরণ করে।[১৬৩]

---

১৬০ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১০/৫৫৭।
১৬১ সহিহ মুসলিম, ১/৬২।
১৬২ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১/৭২; সহিহ মুসলিম, ১/৬৬।
১৬৩ আশ-শিফা বিতারিফি হুকুকিল মুসতফা, ২/৫৪৯।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তোমার ভালোবাসার প্রমাণ হবে তখন, যখন তুমি তার আনুগত্য করবে, তার সুন্নতের অনুসরণ করবে, তার সকল আদেশ মেনে চলবে, নিষেধ থেকে বিরত থাকবে এবং তার গুণে-চরিত্রে নিজেকে সজ্জিত করবে। সুখে-দুঃখে, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা মোটকথা, সর্বাবস্থায় তুমি যখন তার অনুসরণ করবে তখনই তার প্রতি তোমার ভালোবাসা সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

এই কথা সুবিদিত যে, কেউ কাউকে প্রকৃতার্থে ভালোবাসলে সে তার ভালোবাসার মানুষকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়, তার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে সচেতন থাকে। অন্যথায় তার ভালোবাসার দাবি মিথ্যা ছাড়া আর কিছু না।[১৬৪]

পাঁচ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিপূর্ণ সম্মান করা, যথোচিত মর্যাদা প্রদর্শন করা, তাকে সাহায্য করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

> যাতে তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তাকে সাহায্য ও সম্মান করো।[১৬৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের সামনে অগ্রণী হয়ো না, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[১৬৬]

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا.

রাসুলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মতো গণ্য করো না।[১৬৭]

---

১৬৪ আশ-শিফা বিতারিফি হুকুকিল মুসতফা, ২/৫৭১।
১৬৫ সুরা ফাতহ, ৯।
১৬৬ সুরা হুজুরাত, ১।
১৬৭ সুরা নুর, ৬৩।

রাসুলের সম্মান রক্ষা করা এবং তাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বিষয়টি যেমনইভাবে তার জীবদ্দশায় ওয়াজিব ছিল, তেমনই তার ইনতিকালের পরও তা ওয়াজিব। এই সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কিছু নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। যেমন সুন্নতের আলোচনা করা, তার সিরাত পাঠ করা, পরস্পরে তা নিয়ে মুজাকারা তথা আলোচনা-পর্যালোচনা করা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং তার দ্বীনের প্রচার-প্রসার করা।

ছয়. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

> আল্লাহ ও তার ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর জন্য রহমতের তরে দুআ করো এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ করো।[১৬৮]

হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন।'[১৬৯]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবরে পরিণত করো না এবং ইবাদতের নিয়তে আমার কবরের কাছে এসো না। তোমরা বরং আমার ওপর

---

১৬৮ সুরা আহযাব, ৫৬।
১৬৯ সহিহ মুসলিম, ১/২৮৮।

দরুদ পাঠ করো। কেননা তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়।'[১৭০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ওই ব্যক্তি কৃপণ যার নিকট আমার আলোচনা করা হয়, কিন্তু সে আমার ওপর দরুদ পাঠ করে না।'[১৭১]

আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে সম্প্রদায় তাদের সমাবেশে আল্লাহকে স্বরণ করে না এবং তাদের নবীর ওপর দরুদ পড়ে না, সেই সমাবেশ তাদের জন্য আফসোস ও লজ্জার কারণ হবে। এর পরিণামস্বরূপ আল্লাহ তাআলা চাইলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা চাইলে ক্ষমা করে দেবেন।'[১৭২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জমিনে বিচরণকারী অনেক ফিরিশতা রয়েছেন, যারা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার নিকট সালাম পৌঁছে দেয়।'[১৭৩]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ওই ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যার কাছে আমার আলোচনা করা হলো, কিন্তু সে আমার ওপর দরুদ পাঠ করল না।'[১৭৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোনো বান্দা যখন আমার ওপর সালাম পেশ করে, আল্লাহ তাআলা আমার রুহ ফিরিয়ে দেন যেন আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি।'[১৭৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়ার অনেক বরকতময় সময় ও স্থান রয়েছে। ইবনুল কাইয়িম রহ. একচল্লিশটি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্থানের কথা এখানে উল্লেখ করছি—মসজিদে প্রবেশের সময়, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়, আজানের পর, দুআর সময়, নামাজে তাশাহুদ পাঠের পর, জানাজার নামাজে, সকাল-সন্ধ্যায়,

---

১৭০ সুনানে আবু দাউদ, ২/২১৮।
১৭১ সুনানে তিরমিজি, ৩/৩৮৩।
১৭২ সুনানে তিরমিজি, ৩/১৪০।
১৭৩ সুনানে নাসায়ি, ১/২৭৪।
১৭৪ মুসনাদে আহমদ, ৭৪৫১।
১৭৫ সুনানে আবু দাউদ, ২/২১৮।

জুমুআর দিনে, জুমুআর খুতবার সময়, মাহফিল-সভা-সমাবেশে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম বললে, শুনলে ও লিখলে, দুই ঈদের নামাজে, দুআয়ে কুনুতের শেষে, সাফা-মারওয়ায় সায়ি করার সময়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজার সামনে দাঁড়িয়ে, বিপদ-মুসিবতের সময়, দুআ-মাগফিরাত চাওয়ার সময় এবং কোনো গুনাহ হয়ে গেলে কাফফারা হিসেবে বেশি বেশি দরুদ পড়া। এ ছাড়া আরও অনেক বরকতময় সময় ও স্থানে দরুদ পড়ার বেশ মাহাত্ম্য রয়েছে।[১৭৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পাঠের মাহাত্ম্য ও ফজিলত জানার জন্য সাহাবি আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত এই একটি হাদিসই যথেষ্ট, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশবার রহমত অবতীর্ণ করবেন, দশটি গুনাহ মাফ করবেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।'[১৭৭]

সাত. সকল বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত মানা এবং তার আনীত শরিয়তের মাধ্যমে সকল বিষয়ের ফয়সালা করা। এই মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে প্রত্যর্পণ করো—যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত

---

১৭৬ জালাউল আফহাম ফিস-সালালি ওয়াস-সালাম আলা খাইরিল আনাম।
১৭৭ মুসনাদে আহমদ, ৩/২৬১; ইবনে হিব্বান, ২৩৯০।

দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো। এটিই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।[১৭৮]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম! সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনোরকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।[১৭৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তার সুন্নাহ ও আনীত শরিয়তের মাধ্যমে ফয়সালা করার অর্থ হচ্ছে, তার নিকট সকল বিষয়ের ফয়সালা চাওয়া। উম্মতের ওপর এটি রাসুলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি হক।

আট. বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার যথোপযুক্ত স্থানে রাখা। নিশ্চয় তিনি আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা এবং তার রাসুল। তিনি প্রেরিত নবী- রাসুলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব। আল্লাহ তাআলার নিকট প্রশংসিত। তবে সর্বোপরি তিনি একজন মানুষ। আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া কারও কোনো ক্ষতি করতে পারেন না এবং কারও কোনো উপকার করতে পারেন না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ.

আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তা ছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি বলি

১৭৮ সুরা নিসা, ৫৯।
১৭৯ সুরা নিসা, ৬৫।

না যে, আমি ফিরিশতা। আমি তো শুধু সেই ওহির অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা করো না?[১৮০]

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, তবে যা আল্লাহ চান। আমি যদি অদৃশ্যের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম, ফলে আমার কোনো অমঙ্গল কখনো হতে পারত না। আমি তো শুধু ঈমানদারদের জন্য একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা।[১৮১]

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا.

বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুন, আল্লাহর কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয়স্থল পাব না।[১৮২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপরাপর নবী-রাসুলদের মতোই ইনতিকাল করেছেন। তবে তার আনীত দ্বীন বাকি থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ.

---

১৮০ সুরা আনআম, ৫০।
১৮১ সুরা আরাফ, ১৮৮।
১৮২ সুরা জিন, ২১-২২।

নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে।[১৮৩]

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

আপনার পূর্বের কোনো মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[১৮৪]

এর মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয় যে, ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলারই করতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

আপনি বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তার কোনো অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।[১৮৫]

---

১৮৩ সুরা যুমার, ৩০।
১৮৪ সুরা আম্বিয়া, ৩৪-৩৫।
১৮৫ সুরা আনআম, ১৬২-১৬৩।

পঞ্চম আলোচনা—
মুহাম্মদ ﷺ সর্বজনীন ও সর্বশেষ রাসুল :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তা সর্বজনীন। পৃথিবীর সকল মানুষ তার আনীত দ্বীন পালনে আদিষ্ট। তার মাধ্যমে নবুয়ত ও রিসালাতের সমাপ্তি ঘটেছে। তিনি শেষ নবী, তার পর আর কোনো নবী আসবে না।

মুমিন হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্যই আল্লাহর রাসুল। মানবজাতি, জিনজাতি, আরব-অনারব, রাজা-প্রজা—এককথায় সকলের জন্যই তিনি রাসুল। কোনো সৃষ্টির পক্ষেই জাহেরি ও বাতেনিভাবে তার ওপর ঈমান আনা এবং তার অনুসরণ করা ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সম্ভব নয়। এমনকি সে যদি ঈসা ও মুসা আ. এবং অন্য কোনো নবীর ওপর ঈমান আনে, তাদের কারও সাক্ষাৎ হয়, তবুও না। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর তার অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আর কোনো পথ নেই। কারণ তিনি হলেন শেষ নবী, তার পর আর কোনো নবী আসবে না। সুতরাং মুমিন হওয়ার জন্য তার অনুসরণ করা অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

> (হে নবী! আপনি স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন (আর বলেছিলেন), আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও প্রজ্ঞা দান করেছি তা গ্রহণ করো। অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক একজন রাসুল আসবে। তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বলেছিলেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকো আর আমিও তোমাদের সাক্ষী থাকলাম। এরপর যারা ফিরে যাবে (অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে) তারাই অমান্যকারী।[১৮৬]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবী- রাসুলকে প্রেরণের সময় এই মর্মে বলে দিয়েছেন, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের সময় তিনি জীবিত থাকেন, তাহলে তাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং তাকে সাহায্য করতে হবে। আর এই আদেশ দিয়েছেন, তিনি তার উম্মতের থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করবেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পর তারা যদি জীবিত থাকে, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই তার ওপর ঈমান আনতে হবে এবং তাকে সাহায্য করতে হবে।[১৮৭]

যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রিসালাতের সর্বজনীনতা স্বীকার না করবে, সে দুটি বিষয়ের কোনো একটি স্বীকার করবে। এক. মুহাম্মদ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল। কিন্তু তার রিসালাত শুধু আরবের জন্য নির্দিষ্ট। দুই. অথবা সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকেই বিশ্বাস করবে না।

যে ব্যক্তি রাসুলের রিসালাতকে স্বীকার করে কিন্তু মনে করে যে, তার রিসালাত মাত্র আরবদের জন্য, সে মুমিন নয়। সর্বসম্মতিক্রমে মুমিন হওয়ার জন্য পূর্ণ রিসালাতের ওপর এবং এই রিসালাতের সর্বজনীনতার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কারণ রাসুলের নবুয়তের মাধ্যমে অন্য সকল নবী-রাসুলের শরিয়ত ও আনীত দ্বীন মানসুখ তথা রহিত হয়ে গেছে। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনি সকল মানুষের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন।

---

১৮৬ সুরা আলে ইমরান, ৮১-৮২।

১৮৭ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, ১৯/৬৫-৯; আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়ায়ির রহমান ওয়া আওলিয়ায়িশ শাইতান, ৭৭, ১৯১-২০০।

তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন রাজাবাদশাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো, কিসরা, কাইসার, নাজ্জাশি। যারা ইসলামকে অস্বীকার করেছে, তাদের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেছেন। তিনি যেমনইভাবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তেমনইভাবে আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছেন। তাদের বন্দী করেছেন, তাদের ওপর জিজিয়া আরোপ করেছেন। কারণ, তারা পূর্ববর্তী নবী ও রাসুলদের প্রতি ঈমান এনেছিল ঠিক, কিন্তু রাসুলের নবুয়ত ও রিসালাতকে স্বীকার করেনি।

আর যারা রাসুলের রিসালাতকে সম্পূর্ণই অস্বীকার করে, তারা তো সুস্পষ্ট কাফির। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত যে সত্য তা অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে কারিম তো মানুষ ও জিনজাতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই আসছে। কেউ যদি রাসুলের রিসালাতকে অস্বীকার করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে কুরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এর বিপরীত প্রমাণ নিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিতে হবে এবং রাসুল যা নিয়ে এসেছেন তার ওপর ঈমান আনতে হবে। যদি অহংকার প্রদর্শন করতে চায়, তাহলে রাসুল যেমন কুরআন নিয়ে এসেছেন এমন একটা কুরআন তারাও এনে দেখাক। কিন্তু এটা তো অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণই ব্যর্থ। পূর্বের অনেক বড় বড় সাহিত্যিকই এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। আর এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, তারাও ব্যর্থ হবে। কুরআন কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয়, এটি মহামহিম আল্লাহর পক্ষ থেকে। এর অনুরূপ কেউ কখনো রচনা করতে পারবে না, অতীতে পারেনি।

সুতরাং সকলের জন্য আল্লাহর ওপর ঈমান আনা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা বিশ্বাস করা এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা অপরিহার্য।

কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের জন্যই নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি হলেন সর্বশেষ নবী, তার পর আর কোনো নবী আসবে না। ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

আপনি বলে দিন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সকলের প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, সমগ্র আসমান ও জমিনে তার রাজত্ব। একমাত্র তাকে ছাড়া আর কারও উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যুদান করেন। সুতরাং তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর ওপর, তার প্রেরিত উম্মি নবীর ওপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তার সমস্ত কালামের ওপর। তোমরা তার অনুসরণ করো যেন সরল পথপ্রাপ্ত হতে পারো।[১৮৮]

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.

পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তার বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যেন সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়।[১৮৯]

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ.

আমার প্রতি এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কুরআন পৌঁছে সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি।[১৯০]

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কুরআন একটি সর্বজনীন গ্রন্থ। যত মানুষের কাছে এর বার্তা পৌঁছবে, সকলের জন্য এই দ্বীন ও শরিয়ত মানা অপরিহার্য।

এই নবুয়ত ও রিসালাতে ঈমান আনা যে আহলে কিতাবদের জন্যও অপরিহার্য এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী, তার পর আর কোনো

---

১৮৮ সুরা আরাফ, ১৫৮।
১৮৯ সুরা ফুরকান, ১।
১৯০ সুরা আনআম, ১৯।

নবী আসবে না, এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.

যদি তারা আপনার সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দিন, আমি ও আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি। আর আহলে কিতাব এবং নিরক্ষরদের বলুন, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে তারা সরল পথপ্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আপনার দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা।[১৯১]

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

মুহাম্মদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।[১৯২]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।[১৯৩]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

---

১৯১ সুরা আলে ইমরান, ২০।
১৯২ সুরা আহযাব, ৪০।
১৯৩ সুরা আম্বিয়া, ১০৭।

> আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[১৯৪]

অনুরূপ হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন শেষ নবী, তার পর আর কোনো নবী আসবে না। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের নবী। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা আমার পূর্বের কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। তার মধ্যে একটি হলো, আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বিশেষ কোনো একটি সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হয়েছিল। আর আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের নবী হিসেবে।'[১৯৫]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে অত্যন্ত সুন্দর ও চমৎকারভাবে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছে। তবে বাড়িটির এক কোণে একটি ইট স্থাপন করতে বাকি রেখেছে। লোকেরা বাড়িটিতে এসে ঘুরে দেখে এবং আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন এই একটি ইট স্থাপন করা হলো না?' তিনি (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'আমি হলাম সেই ইটের মতো। আমি হলাম শেষ নবী।'[১৯৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই শেষ নবী, তার পর আর কোনো নবী আসবে না। তিনি সর্বজনীন নবী। তার আগমনের পর পূর্বের সকল নবীর নবুয়ত ও শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তার এবং দ্বীন হিসেবে তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার ওপর ঈমান আনয়ন ও আমল করা ওয়াজিব। যে করবে না সে জাহান্নামে যাবে। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! ইহুদি হোক বা খ্রিষ্টান, যে ব্যক্তিই আমার রিসালাতের খবর শুনেও তার ওপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, অবশ্যই সে জাহান্নামে যাবে।'[১৯৭]

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন—

---

১৯৪ সুরা সাবা, ২৮।
১৯৫ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১/৫৩৩; সহিহ মুসলিম, ১/৩৭০।
১৯৬ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৬/৫৫৮; সহিহ মুসলিম, ১৭৯০।
১৯৭ সহিহ মুসলিম, ১৫৩।

قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ.

তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলি এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই।[১৯৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা নিষেধ :

এক. নবী-রাসুল এবং অলি-আওলিয়াদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে শিরক পর্যন্ত নিয়ে যায়। আদম আ.-এর প্রেরণের পর মানুষ ইসলামের ওপরই ছিল। যেমন ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আদম আ. এবং নুহ আ.-এর মাঝের দশ শতক পর্যন্ত মানুষ ইসলামের ওপর ছিল।[১৯৯] এরপর থেকে মানুষ অলি-আওলিয়াদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো এবং ধীরে ধীরে জমিনে শিরক ছড়িয়ে পড়ল। তারপর আল্লাহ তাআলা নুহ আ.-কে প্রেরণ করলেন। তিনি মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকলেন এবং আল্লাহ ব্যতীত আর সকলকিছুর ইবাদত ছেড়ে দিতে বললেন। কিন্তু মানুষ তার ডাকে সাড়া দিলো না, দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.

তারা বলছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে।[২০০]

এগুলো হলো নুহ আ.-এর সম্প্রদায়ের অলি-আওলিয়াদের নাম। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান প্রথমে মানুষকে প্ররোচনা দিলো যে, তারা তোমাদের সম্মানিত

---

১৯৮ সুরা আনআম, ১০৪।
১৯৯ মুসতাদরাকে হাকেম, ২/৫৪৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১/১০১।
২০০ সুরা নুহ, ২৩।

ব্যক্তি। তোমরা তাদের সম্মানে তাদের মূর্তি বানিয়ে নিজেদের কাছে রেখে দাও। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে এই মূর্তি স্থাপন করো এবং তাদের নামে এই মূর্তিগুলোর নাম রাখো। শয়তানের প্ররোচনায় তারা তাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের মূর্তি তৈরি শুরু করল। প্রথমেই এসব মূর্তির ইবাদত করা হতো না। তাদের মৃত্যুর পর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এসে এই সমস্ত মূর্তির ইবাদত ও পূজা শুরু করল।[২০১]

তাওহীদ ছেড়ে শিরকে তাদের লিপ্ত হওয়ার কারণ হলো সালেহিন, বুজুর্গ, অলি-আওলিয়াদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা। শয়তান মানুষকে তাদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি এবং তাদের কবর পূজার দিকে আহ্বান করে। শয়তান মানুষের অন্তরে এই প্ররোচনা দেয় যে, অলি-আওলিয়াদের কবর পাকা করা, অতঃপর সেই কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ করা, সেখানে অবস্থান করা হলো তাদের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন। এর পরবর্তী ধাপে শয়তান তাদের অসিলা দিয়ে দুআ করার প্ররোচনা দেয়। শয়তান তাদের বলে যে, আল্লাহ তাআলার মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। তাই সরাসরি তার নিকট দুআ না করে বরং তার কোনো প্রিয় বান্দার অসিলা দিয়ে তার নিকট দুআ করতে হবে। এই বিশ্বাসটা যখন তাদের অন্তরে দৃঢ় হয়, তখন সরাসরি তাদেরকে কবরে সমাহিত অলি-আওলিয়াদের নিকট দুআ করার প্ররোচনা দেয়। ফলে তারা কবরের কাছে গিয়ে কবরে সমাহিত ব্যক্তিদের নিকট দুআ করতে শুরু করে, কবরের ওপর সিজদা করে এবং আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে তাদের নিকট শাফাআত চায়। কবরকে তারা প্রতিমা হিসেবে গ্রহণ করে। পর্দা, গিলাফ দিয়ে কবর ঢেকে রাখে, চারপাশে তাওয়াফ করে, হাত দিয়ে তা মুছে বরকত নেয়, কবরের ওপর চুমু খায় এবং কবরের নিকট প্রাণী জবাই করে। এরপর চতুর্থ স্তরে শয়তান মানুষদেরকে পূর্ববর্তীদের আকৃতিতে তৈরি করা মূর্তির ইবাদত এবং তাদের কবরের ওপর উরশ করতে বলে। সর্বশেষ স্তর হচ্ছে, যারা এসব গর্হিত শিরকি কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে এবং লোকদেরকে বিরত থাকতে বলে, তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করে। বলে যে, এরা নবী-রাসুল, অলি-আওলিয়াদের সম্মান করে না। ফলে মূর্তি ও করবপূজারিরা তাদেরকে ঘৃণা করে। তাদের ওপর চড়াও হয়।[২০২]

---

২০১ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, কিতাবুত তাফসির, ৮/৬৬৭।
২০২ তাফসিরে কুরতুবি, ২৯/৬২; ফাতহুল মাজিদ, ২৪৬।

এজন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। কাউকে সম্মান জানাতে গিয়ে কথা, কাজে ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে বসানো যাবে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا.

হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সংগত বিষয় ছাড়া কোনো কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়মতনয় মসিহ ঈসা আল্লাহর রাসুল এবং তার বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং তার কাছ থেকে আগত রুহ। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রাসুলগণকে মান্য করো। আর এ কথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, এ কথা পরিহার করো; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান হওয়াটা তার যোগ্য বিষয় নয়। যা-কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।[২০৩]

পূর্ববর্তী লোকেরা বাড়াবাড়ির কারণে শিরকে লিপ্ত হয়েছে বলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে উম্মতকে নিষেধ করেছেন। সতর্ক করে বলেছেন, 'খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনে মরিয়ম আ.-এর প্রশংসা করার ক্ষেত্রে যেমন বাড়াবাড়ি করত, তোমরা আমার প্রশংসা করার ক্ষেত্রে তেমন বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা (আমার ব্যাপারে) বলবে আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।'[২০৪]

---

২০৩ সুরা নিসা, ১৭১।
২০৪ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৬/৪৭৮, ১২/১৪৪।

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ.

তোমরা দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে সাবধান থাকবে, কারণ তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়েছে।[২০৫]

দুই. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ নেককার ও সালেহিনদের কবরের ওপর মসজিদ মির্মাণ ধীরে ধীরে মানুষকে কবরপূজার দিকে নিয়ে যায়। আর এ কারণেই উম্মে হাবিবা এবং উম্মে সালামা রা. যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাবশার একটি গির্জার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যেখানে লোকদের প্রতিকৃতি টানানো ছিল, তখন তিনি বলেন, 'তাদের কোনো নেককার লোক যখন মারা যেত, তার কবরের ওপর তারা মসজিদ নির্মাণ করত এবং সেখানে তাদের আকৃতি তৈরি করত। এইসব লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে।'[২০৬]

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের সময় যখন নিকটবর্তী হলো, তিনি চাদর দিয়ে তার চেহারা ঢাকতে লাগলেন। তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলে চেহারা থেকে চাদর সরিয়ে ফেলছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, 'ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।' এই কথা বলে রাসুল তার উম্মতকে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ন্যায় নবী-রাসুলদের কবরকে মসজিদে রূপান্তর করা থেকে সতর্ক করেন।[২০৭]

জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পাঁচদিন পূর্বে তাকে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের কেউ আমার খলিল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাইছি। কেননা, আল্লাহ তাআলা আমাকে তার খলিলরূপে গ্রহণ করেছেন,

---

২০৫ মুসনাদে আহমদ, ১/৩৪৭; নাসায়ি, ৫/২৬৮।
২০৬ সহিহ মুসলিম, ১/৩৭৫; সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১/৫২৩, ৩/২০৮।
২০৭ সহিহ মুসলিম, ১/৩৩৭; সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১/৫৩২, ৩/২০০।

যেমনইভাবে খলিলরূপে গ্রহণ করেছিলেন ইবরাহিমকে। আমি যদি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে খলিলরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল। সাবধান! তাদের ন্যায় তোমরা কবরকে মসজিদ বানাবে না। আমি তোমাদেরকে এর থেকে নিষেধ করছি।'[২০৮]

তিন. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন তার কবরকে মসজিদ ও প্রতিমা বানিয়ে ইবাদত না করা হয়। হাদিসে এসেছে, রাসুল বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার কবরকে এমন প্রতিমা হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করুন, যার ইবাদত করা হয়। আল্লাহ তাআলা ওই সম্প্রদায়ের ওপর প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হন, যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে রূপান্তর করে।'[২০৯]

যারা কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি লানত করেছেন, যেন এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তারা এই ধরনের গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকে। এক হাদিসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সমস্ত লোকদের ওপর লানত করেছেন, যারা কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে এবং বাতি জ্বালায়।[২১০]

মোদ্দাকথা, উম্মতের মাঝে শিরক প্রবেশ করতে পারে এমন সকল সম্ভাব্য পথ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্ধ করে দিয়েছেন। এক হাদিসে তিনি বলেছেন, 'তোমরা কবরের ওপর বসবে না এবং তার দিকে ফিরে নামাজ পড়বে না।'[২১১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষ্যানুযায়ী, কবর সালাত আদায়ের জায়গা নয়। অন্যদিকে দূরে বা নিকট যেখান থেকেই তার ওপর দরুদ পাঠ করা হবে, তা তার নিকট পৌঁছে দেওয়া হবে। সুতরাং তার কবরের নিকট ইবাদতের জন্য জমা হওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি এর থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

২০৮ সহিহ মুসলিম, ১/৩৭৭।
২০৯ মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১/১৭২।
২১০ সুনানে নাসায়ি, ৪/৯৪; সুনানে আবু দাউদ, ৩/২১৮; সুনানে তিরমিজি, ২/১৩৬।
২১১ সহিহ মুসলিম, ২/৬৬৮।

বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের বাড়িগুলোকে কবর বানিয়ো না এবং তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ো না। (অর্থাৎ আমার কবরের নিকট ইবাদতের উদ্দেশ্যে একত্র হয়ো না।) তোমরা আমার ওপর দরুদ পাঠ করো। কারণ তোমরা যেখানেই থাকো, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়।'[২১২]

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুল বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কিছু ফিরিশতা নিযুক্ত আছে, যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে থাকে এবং আমার প্রতি আমার উম্মতের দরুদ ও সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেয়।'[২১৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব। সে হিসেবে তার কবরও হলো পৃথিবীর শেষ্ঠ কবর। তিনি যখন তার কবরকে ঈদ তথা সেখানে ইবাদত-বন্দেগির জন্য জমা হতে নিষেধ করেছেন, মসজিদে রূপান্তর করতে বারণ করেছেন, তাহলে তো এই নিষেধাজ্ঞা অন্য সকল কবরের জন্য আরও কঠিনভাবে ধর্তব্য হবে, সেটা যার কবরই হোক না কেন।

শিরকের আশঙ্কা আছে এমন সকল মাধ্যম থেকে রাসুল পৃথিবীকে পবিত্র করেছেন। সুতরাং তিনি কবরের ওপর নির্মিত গম্বুজ এবং ছবি ধ্বংস করার জন্য তার সাহাবিদের প্রেরণ করেছেন। আবুল হাইয়াজ আল-আসাদি বর্ণনা করেন, আমাকে আলি ইবনে আবু তালিব রা. বলেছেন, 'আমি কি তোমাকে এমন কাজের জন্য পাঠাব না যার জন্য আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠিয়েছিলেন? তুমি যে মূর্তি বা ছবি দেখতে পাবে তা মুছে ফেলবে এবং সমস্ত (উঁচু) কবর সমান করে দেবে, তা যতই সম্মানিত ব্যক্তির হোক না কেন।'[২১৪]

চার. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরক ও শিরকের সকল উপকরণ থেকে তাওহীদকে মুক্ত করেছেন। তিনি সর্বদা সতর্ক থেকেছেন যেন কোনোভাবেই তাওহীদের সঙ্গে শিরকের মিশ্রণ না ঘটে। আর এ কারণেই তিনি বলেছেন, 'তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সওয়াবের

---

২১২ সুনানে আবু দাউদ, ২/২১৮।
২১৩ সুনানে নাসায়ি, ৩/৪৩।
২১৪ সহিহ মুসলিম, ১/৬৬৬।

উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করবে না। মসজিদ তিনটি হচ্ছে, ১. আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববি)। ২. মসজিদে হারাম। ৩. মসজিদে আকসা।'[২১৫]

উপরিউক্ত হাদিসের ভিত্তিতে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, এই বিষয়ে ইমামগণ একমত যে, যদি কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর অথবা অন্য কোনো নবী-রাসুল বা অলি-আওলিয়াদের কবর জিয়ারতের মান্নত করে, তাহলে তার এই মান্নত পুরা করা ওয়াজিব নয়। তাকে উক্ত মান্নত পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।[২১৬]

পাঁচ. কবর জিয়ারতের প্রকার :

মৌলিকভাবে কবর জিয়ারত দুই প্রকার—

এক. শরয়িভাবে বৈধ জিয়ারত। অর্থাৎ সওয়াবের উদ্দেশ্য ব্যতীত শুধু তাদের কবরে সালাম জানানো এবং তাদের জন্য দুআ করার উদ্দেশ্যে গমন করা। অথবা যখন কেউ মারা যায় তখন তার জানাজায় শরিক হওয়া এবং তার মরদেহের সঙ্গে কবর পর্যন্ত যাওয়া। ইবরত হাসিল বা মৃত্যুকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে কবর জিয়ারত করা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুসরণের উদ্দেশ্যে। এই সকল ক্ষেত্রে শর্ত হলো ইবাদত বা সওয়াবের উদ্দেশ্য না থাকতে হবে।

দুই. শরয়িভাবে অবৈধ জিয়ারত। **এটা আবার তিন প্রকার।**

ক. কবরের নিকট কোনোকিছু চাওয়ার জন্য বা তার ইবাদতের জন্য যাওয়া। এটা মূর্তিপূজার মতোই হারাম এবং শিরকে আকবার যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

খ. কবর বা মৃত ব্যক্তির অসিলা দিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করা। যেমন বলা যে, আমি আপনার অমুক নবী অথবা অমুক অলি-দরবেশ বা পির-গাউসের অসিলায় আপনার নিকট দুআ চাচ্ছি, এটা বিদআত। তবে

---

২১৫ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৩/৬৩; সহিহ মুসলিম, ২/৯৭৬।
২১৬ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, ১/২৩৪।

এটা শিরকে আকবার নয়, যা মানুষকে প্রথম প্রকারের মতো ইসলাম থেকে সম্পূর্ণভাবে বের করে দেয়।

গ. এটা মনে করা যে, কবরের নিকট গিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করা মুসতাহাব, অথবা মসজিদে বসে দুআ করার চেয়ে কবরের নিকট গিয়ে দুআ করা উত্তম। এটা সর্বসম্মতিক্রমে মুনকার বা অনুত্তম কাজ। এমনটি ভাবা ও করা কিছুতেই উচিত নয়।[২১৭]

---

২১৭ আদ-দুরারুস সুন্নিয়া, ৬/১৬৫।

তৃতীয় অধ্যায়

তাওহীদ দুর্বল ও ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ

প্রথম আলোচনা—
আল্লাহর আদেশ অমান্য করা :

যে ব্যক্তি ঈমান ভঙ্গকারী কাজসমূহের কোনো একটি করবে, তার ঈমান ভেঙে যাবে এবং সে মুরতাদ ও কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার কোনো আদেশ অমান্য করাটা দুই ধরনের।

এক. এমন অমান্যতা যার কারণে ঈমান ভেঙে যায় এবং সে মুরতাদ ও কাফির হয়ে যায়। এগুলোকে নাওয়াকিজুল ইসলাম তথা ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় বলা হয়। এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

দুই. এমন অমান্যতা যা ঈমানকে ভেঙে দেয় না এবং ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তবে তা ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। যে ব্যক্তি এমন অমান্যতার কাজ করবে তার ঈমান ভঙ্গ হবে না, কিন্তু সে আল্লাহর নিকট বড় গুনাহগার ও পাপী বলে বিবেচিত হবে। যদি এর থেকে তাওবা না করে মারা যায়, তাহলে তার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে, চাইলে তিনি শাস্তি দেবেন অথবা ক্ষমা করে দেবেন। যেমন হারাম জানা সত্ত্বেও ব্যভিচার করা। ব্যভিচারকারী যদি তাওবা না করে ইনতিকাল করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন অথবা তাকে শাস্তি দেবেন। তার ঈমান ও অন্যান্য নেক আমলের কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

দ্বিতীয় আলোচনা—
ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ :

ঈমান ভঙ্গের অনেক প্রকার রয়েছে, যেগুলো আলিমগণ তাদের গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন কারণে একজন মুসলমানের ঈমান ভেঙে যায় এবং সে মুরতাদ হয়ে যায়। সেই কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ এবং যেগুলোয় মানুষ বেশি পতিত হয়, তা দশটি। নিম্নে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

প্রথম কারণ : ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরিক করা। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তার সঙ্গে কাউকে শরিক করে। এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা, তিনি ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।[২১৮]

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.

২১৮ সুরা নিসা, ১১৬।

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।[২১৯]

আল্লাহর সঙ্গে শিরকের উদাহরণ হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে জবাই। যেমন কবর, জিন বা শয়তানের নামে জবাই করা।[২২০]

দ্বিতীয় কারণ : নিজের ও আল্লাহর মাঝে অন্য কাউকে অসিলা তথা মাধ্যম বানানো। তার নিকট প্রার্থনা করা, তার নিকট শাফাআত চাওয়া, তার ওপর ভরসা করা। সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এটি কুফর।[২২১]

---

২১৯ সুরা মায়িদা, ৭২।

২২০ উল্লেখ্য যে, ঈমান পরিত্যাগকারী মুশরিক যদি বিবাহিত হয়, তাহলে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে যাবে। কারণ শরিয়তের বিধান হলো, মুসলিমা নারী কাফির স্বামীর বিবাহাধীন থাকতে পারবে না। ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ.

তোমরা মুশরিকদেরকে ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিয়ে করো না।—সুরা বাকারা, ২২১।

মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে ইসলামি রীতিতে তার জানাজা, কাফন-দাফন দেওয়া হবে না। কোনো মুমিন তার থেকে মিরাস পাবে না এবং কোনো মুমিনের মিরাসও সে লাভ করবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

মুসলমান কাফিরের এবং কাফির মুসলমানের ওয়ারিশ হয় না।—সহিহ বুখারি, ৬৭৬৪। (সম্পাদক)

২২১ ঈমান ভঙ্গের এই প্রকারটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা জরুরি মনে করছি। অবশ্যই পূর্ণ লেখাটি পড়বেন।

অসিলা আরবি শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো মাধ্যম। কোনোকিছু অর্জনের মাধ্যম বা উপায়-উপকরণকে শাব্দিক অর্থে অসিলা বলা হয়। পরিভাষায় যেসব জিনিসের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা হয় তাকে অসিলা বলে। যেমন নামাজ, রোজা, নেক আমল। এগুলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সর্বাধিক পরিচিত অসিলা।

ইবাদত ও দুআ কবুলের ক্ষেত্রে অসিলা গ্রহণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তার কিছু জায়েজ আর কিছু নাজায়েজ ও শিরক। গ্রন্থে উল্লেখিত যে অসিলাকে শিরক বলা হয়েছে, এর মূল প্রতিপাদ্য হলো, এখানে যাকে অসিলা বা মাধ্যম বানানো হচ্ছে তার ওপর ভরসা করা হচ্ছে। কেমন যেন তাকে দ্বিতীয় প্রভু স্বীকার করা হচ্ছে যে, তিনি সুপারিশ না করলে বা তিনি মাধ্যম না হলে দুআ কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ যাকে অসিলা বানানো হচ্ছে তার ব্যাপারে এ আকিদা পোষণ না করে, বরং এভাবে বলে যে, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসিলায় আমাদের দুআ আপনি কবুল করে নিন। বা অন্য কোনো নেককার ব্যক্তির নাম বলে তার অসিলায় দুআ করে, যেমন, 'হে আল্লাহ! যার হাত পছন্দ হয় আপনি তার অসিলায় আমাদের সকলের দুআ কবুল করে নিন।' তাহলে শিরক হবে না। এভাবে দুআ করা জায়েজ। সহিহ হাদিস দ্বারা তা প্রমাণিত। *সহিহ বুখারি*তে আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا اسْتَسْقَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا . وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا . قَالَ: فَيُسْقَوْنَ.

আমরা যখন অনাবৃষ্টির শিকার হতাম, তখন উমর রা. আব্বাস রা.-এর মাধ্যমে বৃষ্টির দুআ করতেন। উমর রা. বলেন, 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আপনার নিকট অসিলা করতাম। আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আপনার নিকট আমাদের নবীজির চাচাকে অসিলা করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।' আনাস রা. বলেন, এরপর বৃষ্টি হতো।—সহিহ বুখারি, হাদিস ৫১১।

এ হাদিস থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জীবিত ব্যক্তিকে অসিলা বানিয়ে দুআ করা জায়েজ। উমর রা.-এর দুআটি নেককার ব্যক্তির মাধ্যমে অসিলা প্রমাণ করেছে।

এ হাদিসের অন্য বর্ণনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। বর্ণনাটি শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ. তার *আত-তাওয়াসুল* কিতাবের ৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন এবং সহিহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আব্বাস রা. দুআয় বলেছেন—

اللَّهُمَّ! إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَلاءٌ إِلا بِذَنْبٍ، وَلَمْ يُكْشَفْ إِلا بِتَوْبَةٍ، وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِنْ نَبِيِّكَ، وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، وَنَوَاصِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، فَاسْقِنَا الْغَيْثَ.

হে আল্লাহ! প্রত্যেক বালা-মুসিবতই গুনাহের কারণে আসে, আর তাওবা ব্যতীত তা দূর হয় না। হে আল্লাহ! আমার জাতি আমার মাধ্যমে আপনার শরণাপন্ন হয়েছে। কারণ, আপনার প্রিয় নবীর সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে। আপনার সামনে আমাদের গুনাহগার হাতগুলো উপস্থিত এবং উপস্থিত আমাদের তাওবার কপাল। আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন।—ফাতহুল বারি, ২/৩৯৮।

এখানে আব্বাস রা. গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেছেন।

এক. তিনি আল্লাহর নিকট দুআর সময় বলেছেন, আমার জাতি আমার মাধ্যমে হে আল্লাহ, আপনার নিকট আবেদন করেছে। এখানে স্পষ্টভাবে আব্বাস রা.-এর অসিলা প্রমাণিত।

দুই. সাহাবায়ে কেরাম আব্বাস রা.-এর অসিলা গ্রহণের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আব্বাস রা.-এর সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্ক রয়েছে। কারণ তিনি রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা ছিলেন। এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসিলাগ্রহণ প্রমাণিত হয়।

অসিলার বিষয়ে উসমান বিন হানিফ রা. থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ সহিহ হাদিস রয়েছে। তিনি বলেন—

عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ادع الله أن يعافيني . فقال صلى الله عليه وسلم : (إن شئت دعوت لك ، وإن شئت أخرتُ ذاك ، فهو خير لك. [وفي رواية : (وإن شئتَ صبرتَ فهو خير لك)] ، فقال : ادعهُ. فأمره أن يتوضأ ، فيحسن وضوءه ، فيصلي ركعتين ، ويدعو بهذا الدعاء : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتَقْضِي، وَتُشَفِّعُنِي فِيهِ، وَتُشَفِّعُهُ فِيَّ) . قال : ففعل الرجل فبرأ.

ক্ষীণ দৃষ্টির এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, আল্লাহর নিকট আমার চোখের সুস্থতার জন্য দুআ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য দুআ করব, আর চাইলে দুআকে বিলম্বিত করব। এটা তোমার জন্য উত্তম হবে। লোকটি বলল, আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অজু করে উত্তমভাবে দুই রাকাত নামাজ পড়ার নির্দেশ দিলেন। আর এই দুআ করতে বললেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتَقْضِي، وَتُشَفِّعُنِي فِيهِ، وَتُشَفِّعُهُ فِيَّ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনার নবী, রহমতের নবীর অসিলায় আপনার নিকট চাইছি। হে মুহাম্মদ! আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রভুর নিকট আমার এই প্রয়োজনের আবেদন করছি, যেন তা কবুল হয়। হে আল্লাহ! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার ব্যাপারে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করুন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমার এই দুআ কবুল করুন।

উসমান বিন হানিফ রা. বলেন, লোকটি এই দুআ করল। এরপর সে ভালো হয়ে গেল।—মুসনাদে আহমদ, ৪/১৩৮; সুনানে তিরমিজি, ৫/৫৬৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/৪৪১।

এ হাদিস থেকে তিনটি বিষয় প্রমাণিত হলো, এক. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে লোকটি দুআর আবেদন জানিয়েছে। এটি এক ধরনের অসিলা। দুই. স্বয়ং রাসুল

তৃতীয় প্রকার : মুশরিকদের কাফির মনে না করা এবং তাদের কুফরের ক্ষেত্রে সন্দেহ করা অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করা।

চতুর্থ প্রকার : এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দ্বীন ও শরিয়তের চেয়ে অন্য কোনো দ্বীন ও শরিয়ত পরিপূর্ণ বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের চেয়ে অন্য কোনো হুকুম অধিক সুন্দর। যেমন কেউ তাগুতি শাসনব্যবস্থাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত শাসনব্যবস্থার ওপর প্রাধান্য দিলো বা তাকে উত্তম মনে করল।

পঞ্চম প্রকার : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার কোনোকিছুকে ঘৃণা করা কুফর। যদিও সে তার ওপর আমল করে, তবুও সে কাফির হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন।[২২২]

ষষ্ঠ প্রকার : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত ধর্ম ও শরিয়ত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা অথবা প্রতিদান বা শাস্তির বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা কুফর। কেউ যদি এমনটি করে, তাহলে তার ঈমান ভেঙে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ.

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অসিলা বানিয়ে দুআ করা শিক্ষা দিয়েছেন। তিন. লোকটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসিলা দিয়ে দুআ করেছে।

সুতরাং বোঝা গেল, মৌলিকভাবে অসিলাগ্রহণ করে আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করা জায়েজ, যদি তা শিরকযুক্ত না হয়। দুআ তখনই শিরকযুক্ত হয়, যখন অসিলাকারী ব্যক্তিকে দুআ কবুল হওয়া না-হওয়ার মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়। যেমনটি মূল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। (অনুবাদক)

২২২ সুরা মুহাম্মদ, ৯।

আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সঙ্গে, তার বিধিবিধানের সঙ্গে এবং তার রাসুলের সঙ্গে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।[২২৩]

সপ্তম প্রকার : জাদু। কারও ক্ষতিসাধন কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জাদু করা। যারা জাদু করবে, জাদুকে পছন্দ করবে এবং অন্য কারও মাধ্যমে জাদু করাবে তাদের ঈমান ভেঙে যাবে। এর দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার বাণী, কুরআনে তিনি বলেন—

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

তারা ওই শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলাইমান কুফর করেনি, শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফিরিশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য, কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যার দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।[২২৪]

অষ্টম কারণ : কাফিরদের সমর্থন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

২২৩ সুরা তাওবা, ৬৫-৬৬।
২২৪ সুরা বাকারা, ১০২।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালিমদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।[২২৫]

নবম কারণ : ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো শরিয়তের অনুসরণ বৈধ মনে করা। হৃদয়ে এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, কোনো কোনো মানুষ আছে যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দ্বীন ও শরিয়তের উর্ধ্বে। তাদের জন্য ইসলাম মানা আবশ্যক নয়। উদাহরণস্বরূপ যেমন খিজির মুসা আ.-এর ধর্মের বাইরে ছিলেন। এমন বিশ্বাস পোষণ করা কুফর।[২২৬]

---

২২৫ সুরা মায়িদা, ৫১।

২২৬ এর স্বপক্ষে দলিল হলো পবিত্র কুরআনের এই আয়াত—

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম চাইলে তার থেকে সেটা কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরিয়ত প্রত্যেকের জন্য মানা অপরিহার্য। কেউ এর অনুসরণ থেকে বাইরে নয়। কেননা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরিয়ত জিন, ইনসান, আরব-অনারব সকলের জন্য পালনীয়। শরিয়তে মুহাম্মদি আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ শরিয়ত। তা পূর্ববর্তী সকল শরিয়তের বাতিলকারী। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে যত নবী-রাসুল আগমন করেছেন, তাদের সকলের উম্মতের জন্য শরিয়তে মুহাম্মদিকে আবশ্যক করা হয়েছে। যে তা না মানবে সে কাফির ও অবিশ্বাসী বলে পরিগণিত হবে। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের বহু দলিল রয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে—

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا.

পরম কল্যাণময় সেই সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দার প্রতি সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যেন তা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে।

وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا.

দশম প্রকার : আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা ও পরিত্যাগ করা। দ্বীন শিক্ষা না করা এবং তার ওপর আমল না করা কুফর। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ.

যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে জালিম আর কে আছে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবো।[২২৭]

ঈমান ভঙ্গের এই সমস্ত কারণ কেউ ঠাট্টা করে করুক বা সত্যি সত্যি করুক, কাফির হয়ে যাবে। তবে কাউকে যদি কুফর করতে বাধ্য করা হয় এবং সে মুখে ঈমান ভঙ্গের কোনো একটি প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তরে ঠিকই ইসলামের

আমি আপনাকে মানুষের জন্য একজন রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছি। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

হে নবী আপনি বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসুল, যিনি আসমান ও জমিনের রাজত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি জীবনদান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তার বাণীসমূহের ওপর বিশ্বাস রাখো। এবং তোমরা তারই অনুসরণ করো, যেন সঠিক পথের সন্ধান পাও।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

ওই সত্তার শপথ! যার হাতে (আমি) মুহাম্মদের প্রাণ! ইহুদি হোক বা খ্রিষ্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার রিসালাতের খবর শুনেছে অথচ তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(সম্পাদক)

২২৭ সুরা সাজদা, ২২।

প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় রাখে, তাহলে সে কাফির হবে না। এ ক্ষেত্রে অন্তরের অবস্থাই ধর্তব্য হবে, বাহ্যিক আচরণ নয়।

প্রত্যেক মুসলমানকে ঈমান ভঙ্গের এই সকল কারণ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ মানুষ এই বিষয়গুলোয় বেশি পতিত হয়। আল্লাহ তাআলার নিকট ওই সমস্ত বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার কারণে তিনি রাগান্বিত হন এবং যার কারণে কিয়ামতের দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আমিন!

তৃতীয় আলোচনা—
ঈমান ভঙ্গের প্রথম ও চতুর্থ প্রকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা :

এক. ঈমান ভঙ্গের প্রথম প্রকার ছিল শিরক। আল্লাহ তাআলার রাজত্ব ও তার ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরিক করা এবং তার পবিরর্তে অন্য কাউকে উপাস্য মনে করা হলো শিরক। শিরক মানুষের পূর্বের সকল নেক আমল বাতিল করে দেয়।

শিরক মৌলিকভাবে তিন প্রকার।

ক. শিরকে আকবার বা বড় শিরক, যা মানুষকে দ্বীন ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তার সঙ্গে কাউকে শরিক করে। এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।[২২৮]

---

২২৮ সুরা নিসা, ১১৬।

শিরকে আকবার চার প্রকার।

- দুআর ক্ষেত্রে শিরক। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও নিকট দুআ করা। এই ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.

তারা যখন জলযানে আরোহণ করে, তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শিরক করতে থাকে।[২২৯]

- নিয়ত বা ইচ্ছার শিরক। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

যারা দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য চায়, আমি সেখানে তাদের কাজের পুরোপুরি ফল দিয়ে থাকি, সেখানে তাদেরকে কম দেওয়া হবে না। তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছু নেই। এখানে তারা যা করছে তা নিষ্ফল হয়েছে এবং তারা যে-সকল কাজ করত তা অন্যায়।[২৩০]

- আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক। আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে তার পরিবর্তে ধর্মযাজক বা ধর্মীয় পণ্ডিত তথা আলিমদের অনুসরণ করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

---

২২৯ সুরা আনকাবুত, ৬৫।
২৩০ সুরা হুদ, ১৫-১৬।

তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তারা তার শরিক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।[২৩১]

- ভালোবাসার ক্ষেত্রে শিরক। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ.

আর কোনো লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনই ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে।[২৩২]

খ. শিরকে আসগার বা ছোট শিরক, যা মানুষকে দ্বীন ইসলাম থেকে বের করে না, কিন্তু সে অবাধ্য ও গুনাহগার হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন রিয়া তথা লোক-দেখানো বা লৌকিকতাস্বরূপ কোনো আমল করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।[২৩৩]

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও নামে কসম করাও ছোট শিরক। হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে কসম করল, সে হয় কুফর করল নয়তো শিরক করল।'[২৩৪]

---

২৩১ সুরা তাওবা, ৩১।
২৩২ সুরা বাকারা, ১৬৫।
২৩৩ সুরা কাহফ, ১১০।
২৩৪ সুনানে তিরমিজি, ৪/১১০।

তেমনইভাবে একে অপরকে বলা যে, যদি আল্লাহ এবং তুমি না থাকতে তাহলে আমি মরেই যেতাম অথবা যদি আল্লাহ এবং তুমি চাও তবেই এই কাজটি সম্পাদিত হবে।

গ. গোপন শিরক। হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এই উম্মতের মধ্যে অন্ধকার রাতে কালো পাথরের ওপর কালো পিঁপড়ার নড়াচড়ার চেয়েও গোপনে শিরক প্রবেশ করবে।'[২৩৫]

শিরকে আসগারের কাফফারা বা শিরকে আসগার থেকে বাঁচার উপায় হলো, বেশি বেশি এই দুআ পড়া—

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ وَ أَسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذَّنْبِ الذِيْ لَا أَعْلَمُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা শাইআন ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আসতাগফিরুকা মিনায যানবিল্লাযি লা আ'লাম।

হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমি জেনে-বুঝে শিরক করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং এমন গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি, যা আমি না জেনে করে ফেলেছি।[২৩৬]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন—

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

অতএব, তোমরা জেনে-বুঝে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করো না।[২৩৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আনদাদ তথা সমকক্ষ বানানো হলো এমন শিরক, যা অন্ধকার রাতে কালো পাথরের ওপর কালো পিঁপড়ার নড়াচড়ার চেয়েও গোপনে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করবে। যেমন এমন কথা বলাও শিরক যে, 'হে রাশিদ, আল্লাহর কসম এবং তোমার কসম। আমার জীবনের কসম, কুকুরটা না

---

২৩৫ মুসতাদরাকে হাকেম, ৩/২৩৩।
২৩৬ মুসতাদরাকে হাকেম, ৩/২৩৩।
২৩৭ সুরা বাকারা, ২২।

থাকলে বাড়িতে চোর প্রবেশ করত। বাড়িতে হাঁসগুলো না থাকলে আজ আমার গৃহে চুরি হতো।' এক ব্যক্তি অপরকে বলা, 'হে, যদি আল্লাহ চান এবং তুমি চাও তবেই কাজটি হবে। যদি আল্লাহ তাআলা না থাকতেন এবং তুমি না থাকতে, তাহলে আমি আজ মরেই যেতাম।' এই সমস্ত কথা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বে উল্লেখিত এই হাদিস, 'যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে কসম করল, সে হয় কুফর করল নয়তো শিরক করল' সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, আলিমদের কেউ কেউ বলেন, 'সে হয় কুফর করল নয়তো শিরক করল' দ্বারা শিরকে আকবার বোঝানো হয়েছে। এর স্বপক্ষে তারা দলিল পেশ করেন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস দিয়ে। ইবনে উমর রা. বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর রা.-কে বলতে শুনলেন, তিনি বলছেন, 'আমার বাবার কসম, আমার বাবার কসম!' তখন রাসুল বললেন, 'সাবধান! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন।'[২৩৮]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লাত ও উজ্জার নামে কসম করে, সে যেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে নেয় (অর্থাৎ আবার নতুন করে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়)।'

গোপন শিরক আর শিরকে আসগার সাধারণত একই প্রকার। তখন শিরকের প্রকার হবে দুইটি, শিরকে আকবার, শিরকে আসগার। ইবনুল কাইয়িম রহ. তার *আল-জাওয়াবুল কাফি* গ্রন্থে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।[২৩৯]

দুই. ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ প্রকার এবং নিফাক ও বিদআত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা :

ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ প্রকারের মধ্যে সেই সকল লোক অন্তর্ভুক্ত, যারা বিশ্বাস করে যে, মানবরচিত কোনো বিধান বা অন্য কোনো শরিয়ত ইসলামি শরিয়ত বা বিধানের চেয়ে উত্তম। অথবা উভয়টা সমান। অথবা এটা বিশ্বাস করে যে, ইসলামি শরিয়তই উত্তম কিন্তু মানবরচিত বিধান দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতে কোনো সমস্যা নেই। অথবা মনে করে যে, এই বিশ-একুশ শতকে

---

২৩৮ সুনানে তিরমিজি, ২/৯৯।
২৩৯ আল-জাওয়াবুল কাফি, ২৩৩।

এসে ইসলামি শরিয়ত আর চলবে না, এটা এই সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। অথবা মনে করা যে, এটাই হলো মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ। অথবা এটা মনে করা যে, ইসলামি শরিয়ত বা ধর্ম হলো মানুষের সঙ্গে তার স্রষ্টার সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যম, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে তার কোনো ভূমিকা নেই, বা তার ভূমিকা গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে যে মনে করে, আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করে চোরের হাত কাটা অথবা বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মহিলা ব্যভিচার করলে পাথর মেরে হত্যা করা বর্তমান এই আধুনিক পৃথিবীতে চলবে না। তেমনইভাবে ওই ব্যক্তিও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, যে মনে করে লেনদেন, আদান-প্রদান, অপরাধের সাজাসহ আরও কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর শরিয়ত ব্যতীত অন্য কোনো বিধান দিয়েও পরিচালনা করা যাবে, যদিও সে ইসলামি শরিয়তকে উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে। এই বিষয়ে সকল আলিম একমত যে, এর মাধ্যমে আল্লাহর হারাম করা বিষয়কে হালাল করা বা বৈধ মনে করা হয়। আর যারা আল্লাহর হারাম করা বিষয়কে হালাল মনে করে, তারা মুসলমানদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাফির।

মোটকথা, আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোনো বিধান দিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনা করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ। আশা করি এখানে সংক্ষেপে যতটুকু আলোচনা করা হলো এটাই যথেষ্ট। আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোনো বিধান দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা হারাম এবং যে তা করবে সে কাফির, এর স্বপক্ষে দলিল হিসেবে নিম্নে কয়েকটি আয়াত পেশ করছি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা কাফির।[২৪০]

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালিম।[২৪১]

---

২৪০ সুরা মায়িদা, ৪৪।
২৪১ সুরা মায়িদা, ৪৫।

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা পাপাচারী।[২৪২]

আল্লাহর আয়াতের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা না করলে তার হুকুম দুই ধরনের। এক. সে মুরতাদ হয়ে যাবে, অর্থাৎ ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যাবে। দুই. এর মাধ্যমে সে কবিরা গুনাহকারী ও ফাসিক বলে বিবেচিত হবে। আর এ কারণেই আলিমগণ কাফির, জালিম ও ফাসিক শব্দসমূহকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন। প্রথম প্রকার হলো, বড় কুফর, বড় জুলুম, বড় নিফাক। দ্বিতীয় প্রকার হলো, ছোট কুফর, ছোট জুলুম, ছোট শিরক, ছোট ফিসক এবং ছোট নিফাক।

প্রথম প্রকারগুলো মানুষকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের করে দেয়। কারণ এগুলো সম্পূর্ণ ইসলামের বিপরীত। সুতরাং বড় কুফরের কোনো একটি করার দ্বারা সে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং তার ওপর ইরতিদাদের সকল হুকুম কার্যকর হবে।

আর দ্বিতীয় প্রকারগুলো মানুষকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করবে না, কিন্তু তার ঈমান ত্রুটিযুক্ত হবে এবং সে কবিরা গুনাহকারী, ফাসিক ও বড় নাফরমান বলে গণ্য হবে।

আলিমগণ বলেছেন, আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধানের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করা চারটি বিষয় থেকে মুক্ত নয়।

ক. যে বলে আমি মানবরচিত বিধানের মাধ্যমে ফয়সালা করি, কারণ এটা ইসলামি শরিয়তের চেয়ে উত্তম। এটা বড় কুফর। এর দ্বারা সে সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

খ. যে বলে আমি মানবরচিত বিধানের মাধ্যমে ফয়সালা করি, কারণ এটাও ইসলামি শরিয়তের মতোই। এই দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটাও বড় কুফর। এর দ্বারা সে সম্পূর্ণরূপে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

---

২৪২ সুরা মায়িদা, ৪৭।

গ. যে বলে আমি মানবরচিত বিধানের মাধ্যমে ফয়সালা করি। যদিও ইসলামি শরিয়তই উত্তম। কিন্তু এর মাধ্যমে বিচার করলে কোনো সমস্যা নেই। এটাও বড় কুফর। এর দ্বারা সে সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

ঘ. যে মানবরচিত বিধানের মাধ্যমে ফয়সালা করে, কিন্তু সে এই কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধানের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করা জায়েজ নেই। আল্লাহর বিধানই সর্বোত্তম এবং আল্লাহর বিধানের বাইরে যাওয়াও জায়েজ নেই। কিন্তু সে এটা মানার ব্যাপারে শিথিলতা করে, অথবা সরকারের পক্ষ থেকে চাপের কারণে এমনটি করে। তাহলে সেও কুফর করল, কিন্তু তার এই কুফরটা বড় কুফর নয়, বরং এটা ছোট কুফর। সুতরাং সে এর মাধ্যমে ইসলাম থেকে একেবারে বের হয়ে যাবে না, অবাধ্য মুসলিম ও ফাসিক বলে গণ্য হবে। আর এটি হলো সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ। তাকে মুসলিম বলা যাবে এবং মুসলমানদের যাবতীয় বিষয় তার ওপর কার্যকর হবে।

কুরআন ও হাদিসে যে কুফর, শিরক, জুলুম, ফিসক ও নিফাকের কথা উল্লেখ হয়েছে তা দুই প্রকার :

ক. বড় কুফর, বড় শিরক, বড় জুলুম, বড় ফিসক ও বড় নিফাক। এগুলো মানুষকে সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এমতাবস্থায় যদি মারা যায়, তাহলে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

খ. ছোট কুফর, ছোট শিরক, ছোট জুলুম, ছোট ফিসক ও ছোট নিফাক। এগুলো মানুষকে সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তবে ঈমানকে ত্রুটিযুক্ত করে। সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন বলে তখন বিবেচিত হয় না। প্রথম প্রকারের ব্যক্তিদের ন্যায় এই দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তিগণ চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। তার বিষয়টি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার ওপর মওকুফ থাকবে। আল্লাহ তাআলা চাইলে তাকে মাফ করে দেবেন। আবার চাইলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, অতঃপর তার পাপ অনুযায়ী নির্দিষ্ট একটা সময় জাহান্নামে শাস্তিভোগ করার পর নিজ দয়া ও রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

তিন. নিফাকের প্রকারভেদ :

নিফাক দুই প্রকার।

ক. নিফাকে ইতিকাদি তথা আকিদাগত নিফাক, যা মানুষকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়। নিফাকে ইতিকাদি আবার ছয় প্রকার।

- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তকে মিথ্যা মনে করা।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা মিথ্যা মনে করা।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘৃণা করা।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তাকে ঘৃণা করা।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনের সংকোচন বা দ্বীনের ক্ষতি দেখে মনে আনন্দ অনুভব করা।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও বিজয় দেখে মনে কষ্ট অনুভব করা।

সুতরাং যার মধ্যে এই ছয় প্রকার বা এর কোনো এক প্রকার থাকবে, সে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে।

খ. নিফাকে আমলি তথা আমলগত নিফাক। এই প্রকারের নিফাক মানুষকে সম্পূর্ণ ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তবে সে কবিরা গুনাহকারী ও নাফরমান বান্দা বলে গণ্য হয়। এটা পাঁচ প্রকার।

- মিথ্যা কথা বলা।
- ওয়াদা ভঙ্গ করা।
- আমানতের খিয়ানত করা।
- ঝগড়াবিবাদের সময় অশ্লীল কথা বলা।
- প্রতারণা করা।[২৪৩]

এই নিফাকের মাধ্যমে মানুষ ইসলাম থেকে একেবারে বের হয়ে যায় না। কারণ এটা ছোট নিফাক। যেমন হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

২৪৩ মাজমুআতুত তাওহিদ, ৮।

বলেছেন, 'চারটি স্বভাব যার মধ্যে রয়েছে সে প্রকৃত মুনাফিক। যার মধ্যে চারটির একটিও থাকে, সে তা বর্জন না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব রয়ে যায়। সে চারটি হচ্ছে, ১. কথা বললে মিথ্যা বলা। ২. চুক্তি করলে তা ভঙ্গ করা। ৩. প্রতিশ্রুতি দিয়ে বরখেলাপ করা। ৪. ঝগড়ার সময় গালিগালাজ করা।'[২৪৪]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুনাফিকের আলামত তিনটি। ১. কথা বললে মিথ্যা বলে। ২. প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ করে। ৩. তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে।'[২৪৫]

চার. কবরকে কেন্দ্র করে সংঘটিত বিভিন্ন বিদআত :

প্রথম প্রকার : কবর বা মৃত ব্যক্তির নিকট দুআ করে। এটা মূর্তিপূজারই একটা প্রকার। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.

বলুন, আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে করো, তাদেরকে আহ্বান করো। অথচ তারা তো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্যলাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তার রহমতের আশা করে এবং তার শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ।[২৪৬]

---

২৪৪ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১/৮৯; সহিহ মুসলিম, ১/৭৮।
২৪৫ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১/৮৯; সহিহ মুসলিম, ১/৭৮।
২৪৬ সুরা বনি ইসরাইল, ৫৬-৫৭।

যারা আল্লাহর পরিবর্তে কোনো নবী-রাসুল, অলি-আওলিয়া ও পির-দরবেশের নিকট প্রার্থনা করে এই আয়াত তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি শিরকে আকবার তথা বড় শিরক, যা আল্লাহ তাআলা তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করবেন না। যারা নবী-রাসুল, অলি-আওলিয়া, পির-দরবেশ বা কোনো কবর-দরগার পূজা করে, তার নিকট প্রার্থনা করে, যেমন হে দয়াল! আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন, আমাকে সন্তানদান করুন ইত্যাদি। এই সমস্ত কথা শিরক ও মারাত্মক ভ্রষ্টতা। আল্লাহ তাআলা নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাজিল করেছেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত এবং তার সঙ্গে কাউকে শরিক না করার জন্য।

দ্বিতীয় প্রকার : কবরের নিকট দুআ করলে দুআ কবুল হয় বা মসজিদে দুআ করার চেয়ে কোনো ওলি-আওলিয়ার কবরে গিয়ে দুআ করা উত্তম, এমন ধারণা করা বিদআত ও পরিত্যাজ্য। এই বিষয়ে সকল ইমাম একমত। এটা এমন এক বিষয়, যা কুরআন-হাদিস, সাহাবা, তাবেয়ি বা ইমামদের কারও আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

সাহাবায়ে কেরাম কয়েকবার খরা ও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু তারা কেউই এসব থেকে মুক্তির জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের নিকট গিয়ে দুআ করেননি। বরং উমর রা. আব্বাস রা.-কে সঙ্গে নিয়ে মদিনার বাইরে গিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছেন। সালাফগণ কবরের নিকট গিয়ে দুআ করতে নিষেধ করেছেন। আলি ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের নিকট প্রবেশ করে দুআ করল। এ দেখে তিনি লোকটিকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদিস শোনাব না, যা আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি। তিনি আমার দাদার সূত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আমার কবরকে ঈদ তথা একত্রিত হওয়ার স্থানে পরিণত করো না এবং তোমাদের ঘরসমূহকে কবর বানিয়ো না। তোমরা যেখানেই থাকো, সেখান থেকেই আমার ওপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করো, তোমাদের দরুদ ও সালাম আমার নিকট পৌঁছানো হয়।'[২৪৭]

---

২৪৭ ফাদলুস সালাত আলান নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ৩৪।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং তার কবর হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবর। তিনি তার কবরকে একত্রিত হওয়ার স্থান বানাতে নিষেধ করেছেন। তাহলে তো অন্যদের কবরের নিকট একত্র হওয়া বা তার নিকট দুআ করা অবশ্যই নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবর বানিয়ো না এবং আমার কবরকে ঈদ তথা একত্র হওয়ার স্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার ওপর দরুদ পাঠ করো, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়।'[২৪৮]

চতুর্থ আলোচনা—ঈমান ভঙ্গের মূলনীতি :

চারটি মাধ্যমে ঈমান ভঙ্গ হয়। যথা, কথা, কাজ, বিশ্বাস ও সন্দেহ। নিম্নে এ ব্যাপারে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হলো।

শাইখ আবদুল আজিজ ইবনে আবদুল্লাহ বিন বাজ বলেন, ইসলামি আকিদার পরিপন্থী এবং সাংঘর্ষিক কিছু বিষয় রয়েছে। সেগুলো দুইভাগে বিভক্ত। এক. যা সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। দুই. সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, তবে ঈমানকে ত্রুটিযুক্ত করে, ঈমানকে দুর্বল করে।

প্রথম প্রকার : এই প্রকারকে ঈমান ভঙ্গকারী বলা হয়। যার মাধ্যমে রিদ্দাহ ওয়াজিব হয়, অর্থাৎ মানুষ সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। আর ঈমান ভঙ্গ হয় কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে, বিশ্বাসের মাধ্যমে এবং সন্দেহের মাধ্যমে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে তার ধর্ম পরিবর্তন করে (অর্থাৎ ইসলাম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে), তাকে তোমরা হত্যা করো।'[২৪৯]

মুরতাদের বিধান হলো, প্রথমে তাকে তাওবা করে পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করতে বলা হবে। যদি তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে তাহলে তো ভালো, অন্যথায় (শরয়ি আদালত ও বিচারকের রায়ের মাধ্যমে) তাকে হত্যা করা হবে। পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে।

রিদ্দাহ তথা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া কয়েকভাবে হতে পারে।

---

২৪৮ সুনানে আবু দাউদ, ২/২১৮।
২৪৯ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ১৩/৩৩৯।

ক. রিদ্দাতে কওলি (কথার মাধ্যমে রিদ্দাহ)। যেমন আল্লাহ তাআলাকে গালি দেওয়া, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেওয়া, আল্লাহ তাআলার দিকে কোনো ত্রুটির অপবাদ দেওয়া। যেমন এ কথা বলা যে, আল্লাহ দরিদ্র, তিনি জালিম, তিনি কৃপণ অথবা এ কথা বলা, আল্লাহ কিছু কিছু জিনিস জানেন না। অথবা এ কথা বলা যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর নামাজ ওয়াজিব করেননি। ইত্যাদি কথার মাধ্যমে মানুষ মুরতাদ হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের জবানকে হিফাজত করুন।

খ. রিদ্দাতে ফেলি (কর্মের মাধ্যমে রিদ্দাহ)। যেমন নামাজ বর্জন করা। ইচ্ছাকৃত নামাজ তরক করা এবং পরে কাজা আদায় না করা কুফর। হাদিসে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে যে আহদ বা অঙ্গীকার রয়েছে তা হলো সালাত। সুতরাং যে তা ছেড়ে দিলো সে কুফর করল।'[২৫০]

এই কুফরের অন্তর্ভুক্ত আরও কয়েকটি বিষয় এখানে উদাহরণত উল্লেখ করছি। যেমন অবজ্ঞা করে কুরআন শরিফ ফেলে দেওয়া বা পা দিয়ে লাথি দেওয়া (নাউযুবিল্লাহ), কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা, কবরে সিজদা করা ইত্যাদি কাজ হলো রিদ্দাতে ফেলি। তবে এ সকল কাজ যদি আল্লাহ তাআলার ইবাদত মনে করে করে, তাহলে এটা বিদআত হবে। আর বিদআত অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তবে এর মাধ্যমে লোকে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। ভয়াবহতার দিক থেকে এটা ছোট কুফর।[২৫১]

তেমনইভাবে গাইরুল্লাহর নামে পশু জবাই করা রিদ্দাতে ফেলির অন্তর্ভুক্ত।

গ. আকিদা বা বিশ্বাসগত রিদ্দাহ। যেমন কেউ অন্তর থেকে বিশ্বাস করল, আল্লাহ তাআলা জালিম, তিনি কৃপণ (নাউযুবিল্লাহ)। যদিও সে এগুলো মুখে উচ্চারণ না করে। অথবা কেউ অন্তরে বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

---

২৫০ সুনানে তিরমিজি, ৫/১৪।

২৫১ তবে বিদআতের একটি দিক কুফরের চেয়েও জঘন্য। শিরক বা কুফর থেকে মানুষ কখনো তাওবা করে ফিরে আসে। কিন্তু বিদআত এত জঘন্য ও ভয়াবহ যে এর থেকে ফিরে আসার সুযোগ খুব কমই হয়। কারণ বিদআত করা হয় ইবাদত মনে করে। ফলে বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি আমৃত্যু এটাকে ইবাদত মনে করে তাতে অটল ও অবিচল থাকে। ফলে তাওবা করার অনুভূতি তার অন্তরে কখনো জাগ্রত হয় না। কারণ তাওবা তো করা হয় তখন, যখন কেউ বুঝতে পারে সে গুনাহ করেছে। বিদআতি ব্যক্তি তার কর্মকে গুনাহই মনে করে না। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন। (সম্পাদক)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যাবাদী, কোনো একজন নবী মিথ্যাবাদী অথবা মনে মনে এটা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কারও ইবাদত করলে কোনো সমস্যা নেই। ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে মানুষ মুরতাদ হয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন—

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.

আর এটা এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য; আর তার পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান।[২৫২]

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ.

আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।[২৫৩]

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্যপ্রার্থনা করি।[২৫৪]

যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অন্য কারও ইবাদত করা বৈধ এবং সে তা মুখেও স্বীকার করে, তাহলে সে কথা ও বিশ্বাস উভয়টার মাধ্যমে কুফর করল। আর যদি সে কর্মের মাধ্যমেও এটা সম্পাদন করে, তাহলে সে কথা, কাজ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে কুফর করল।

কথা, কাজ ও বিশ্বাসের কুফরটা আমাদের সময়ে অনেক দেখা যায়। যেমন মানুষ কবর বা মাজারে গিয়ে সিজদা করে, এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং মানুষের কাছে এটা প্রচারও করে। এই সকল লোকদের বিধান হলো, তাদেরকে তাওবা করতে বলা হবে, যদি তাওবা করে তাহলে তো ভালো, অন্যথায় হত্যা করা হবে।

---

২৫২ সুরা হজ, ৬২।
২৫৩ সুরা বাকারা, ১৬৩।
২৫৪ সুরা ফাতিহা, ৫।

ঘ. শক বা সন্দেহের মাধ্যমে রিদ্দাহ। যেমন কেউ বলল, আমি আসলে জানি না যে, আল্লাহ আছে নাকি নেই, আমি জানি না যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য নাকি মিথ্যা অথবা বলল, আমি জানি না যে, মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে নাকি হবে না। এমন জঘন্য কথা বলার দ্বারা সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তার হুকুম হলো, তাকে তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসতে বলা হবে। যদি তাওবা করে তাহলে তো ভালো, অন্যথায় (শরয়ি আদালত ও বিচারকের রায়ের মাধ্যমে) হত্যা করা হবে।

আর যদি সে মুসলমানদের সমাজ থেকে অনেক অনেক দূরে থাকে, যেমন দূরবর্তী কোনো বনজঙ্গলে, তাহলে প্রথমে তার নিকট প্রকৃত বিষয়টি স্পষ্ট করা হবে, আল্লাহ ও তার রাসুলের পরিচয় তার নিকট তুলে ধরা হবে। স্পষ্ট হওয়ার পরও যদি সে অবাধ্য হয়, তাহলে তার হুকুমও মুরতাদের অনুরূপ।

কোনো মুমিন বান্দার অন্তরে যদি ওয়াসওয়াসা বা প্রবঞ্চনা আসে এবং সে এটাকে মনের মধ্যে স্থির হতে দেয় না এবং কথা বা কাজেও পরিণত করে না, তাহলে এটা তার ঈমানের কোনো ক্ষতি করবে না। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের থেকে মনের ওয়াসওয়াসার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা সেটা মুখে বলে অথবা কাজে পরিণত করবে।'[২৫৫]

মনের মধ্যে ওয়াসওয়াসা এলে করণীয় :

- আল্লাহ তাআলার নিকট শয়তান থেকে পানাহ চাইবে, 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' পড়বে।[২৫৬]
- অন্তরে যে বিষয়ে ওয়াসওয়াসা আসে, তার থেকে দ্রুত মনকে ঘুরিয়ে নেবে। অন্য কোনো বিষয়ে মনকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।[২৫৭]
- আমি 'আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান আনলাম' বলতে থাকবে।[২৫৮]

দ্বিতীয় প্রকার প্রতিবন্ধকতা : এর মাধ্যমে ঈমান ভঙ্গ হয় না, তবে দুর্বল হয়, হ্রাস পায়। যেমন সুদ খাওয়া, হারাম কাজ করা, জিনা করা, বিদআত করা,

২৫৫ সহিহ মুসলিম, ১/১৬।
২৫৬ সহিহ মুসলিম, ১/১২০।
২৫৭ সহিহ মুসলিম, ১/১১৯-১২০।
২৫৮ সহিহ মুসলিম, ১/১২০।

জন্মদিন পালন করা, ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা। ইত্যাদি এসব গর্হিত কাজের মাধ্যমে মানুষের ঈমান দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ হয়। তবে যদি ঈদে মিলাদুন নবী পালন করতে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সাহায্য চাওয়া হয়, তার নিকট দুআ করা হয়, তাহলে এই বিদআতটা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে, অর্থাৎ ঈমান ভেঙে যাবে। কেননা সাহায্য ও যেকোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য দুআ একমাত্র আল্লাহর কাছে করতে হবে।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলো, কোনোকিছুকে অশুভ মনে করা, যেমনটি জাহিলিয়াতের যুগে মানুষ করত। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন—

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ.

> তারা বলল, তোমাকে এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি। সালেহ বললেন, তোমাদের মঙ্গল-অমঙ্গল আল্লাহর কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।[২৫৯]

সুতরাং কোনোকিছুকে অশুভ মনে করা ছোট শিরক। অনুরূপভাবে ইসরা ও মিরাজের রাতকে বরকতের মনে করা। গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি হলো, কুরআন, হাদিস ও উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত বিষয়ের বিপরীত কোনো কাজকে দ্বীনের বিষয় মনে করে করাই হলো বিদআত। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে আমাদের বিষয়ে (তথা দ্বীনের বিষয়ে) এর মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত না তা প্রত্যাখ্যাত।'[২৬০]

এখানে সংক্ষেপে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম।[২৬১]

---

২৫৯ সুরা নামল, ৪৭।

২৬০ সহিহ বুখারি, ফাতহুল বারি, ৫/৩০১; সহিহ মুসলিম, ৩/১৩৪৩।

২৬১ ১৪০৩ হিজরিতে প্রদত্ত বিন বাজ রহ.-এর একটি বয়ান থেকে সংগৃহীত। বয়ানের লিখিত একটি কপি আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মুশরিকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত, পথ ও পদ্ধতি

ভূমিকা :

প্রতিমার আরবি শব্দ الوثن 'আল-ওয়াসান'। আর প্রতিমাপূজারিকে বলা হয় الوثني 'আল-ওয়াসানি'। যেমন বলা হয়ে থাকে, رجل وثني 'পুরুষ মূর্তিপূজারি'। امرأة وثنية 'মহিলা মূর্তিপূজারি'। قوم وثني 'মূর্তিপূজারি সম্প্রদায়'।

আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে আর যা-কিছুর ইবাদত করা হয়, তাদের সবকিছুকেই 'ওয়াসান' বলা হয়। চাই সেটা কোনো কবর হোক, কোনো প্রতিকৃতি অথবা স্তম্ভ বা অন্য কোনো জিনিস।

আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে অন্য কাউকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে ডাকা শিরক। এটা শিরকে আকবার। যারা আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে কোনো নবী, অলি, জিন, ফিরিশতা বা অন্য কাউকে ডাকে, তারা মুশরিক। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

> নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সঙ্গে শরিক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সঙ্গে, সে যেন বিরাট অপবাদ আরোপ করল।[২৬২]

মুশরিকদেরকে আল্লাহ একত্ববাদের দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে তাদের মেধা ও অবস্থার প্রতি লক্ষ করে অত্যন্ত সচেতনতা ও হিকমা অবলম্বন করে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। নিম্নের কয়েকটি আলোচনায় বিষয়গুলো স্পষ্ট করা হয়েছে

---

২৬২ সুরা নিসা, ৪৮।

প্রথম আলোচনা—
আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করা :

যারা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর ইবাদত করে, তাদের জন্য নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দলিল—

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.

তারা কি মৃত্তিকা দ্বারা তৈরি উপাস্য গ্রহণ করেছে, যে তারা তাদেরকে জীবিত করবে? যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব, তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র। তিনি যা করেন, তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।[২৬৩]

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে তিনি ব্যতীত পৃথিবীতে আর যত ইলাহের ইবাদত করা হয়, তাদের সকল ইলাহকে অস্বীকার করেছেন। এখন সেই ইলাহ বা প্রতিমা হোক মাটি, পাথর, কাঠ বা অন্যকিছুর। তারা কেউই সত্য ইলাহ নয়। তারা কি মৃতকে জীবিত করতে পারে বা জীবিতকে মৃত? এর উত্তর হবে, না। তারা এর কিছুই করতে পারে না। যদি আসমান ও জমিনের মধ্যে অন্য কোনো ইলাহ থাকত এবং সে ইবাদতের উপযুক্ত হতো, তাহলে তো আসমান ও জমিন ধ্বংস হয়ে যেত এবং ধ্বংস হয়ে যেত তাতে যত সৃষ্টি আছে তা। কারণ যখন একাধিক ইলাহ থাকবে, তখন তাদের পরস্পরে মতানৈক্য

---

২৬৩ সুরা আম্বিয়া, ২১-২৩।

বাধবে, ঝগড়াবিবাদ হবে। ফলে পৃথিবীর কার্যক্রম ব্যাহত হবে, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

যদি দুইজন ইলাহের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়, তাহলে একজন একটা জিনিস সৃষ্টি করতে চাইবে, অপরজন তা সৃষ্টি করতে চাইবে না। একজন কাউকে কিছু দিতে চাইবে, অপরজন চাইবে না। একজন কোনো সৃষ্টিকে চলমান রাখতে চাইবে, অপরজন চাইবে না। ফলে তখন মহাবিশ্বের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং তা ধ্বংস হয়ে যাবে। এর পেছনে যৌক্তিক কিছু কারণও আছে—

- ❖ যদি দুইজন ইলাহের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয়, তাহলে একইসঙ্গে একটা জিনিসের দুই ধরনের অস্তিত্ব জরুরি হয়ে পড়বে। অথচ একসঙ্গে একটা জিনিসের দুই ধরনের অস্তিত্ব অসম্ভব। যেমন একইসঙ্গে একটা জিনিস জীবিত ও মৃত, অথবা স্থির ও চলমান হতে পারে না।
- ❖ যদি দুইজনের কারও ইচ্ছারই বাস্তবায়ন না ঘটে, তাহলে তো তারা কেউই রব নয়। কারণ রব তো তিনিই, যার সকল ইচ্ছা সর্বদাই কার্যকর হয়।
- ❖ যদি তাদের দুইজনের মধ্য থেকে একজনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়, তাহলে অপরজনের রুবুবিয়্যাত বা প্রভুত্ব বাতিল হয়ে যায়। কারণ যার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে সেই শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান। আর অপরজন দুর্বল, অপারগ।
- ❖ অন্যদিকে সকল বিষয়ে সবসময় তাদের মতামত একরকম হওয়াও সম্ভব না।

সুতরাং কখনোই একাধিক ইলাহের অস্তিত্ব সম্ভব না। বরং এমন একজন ইলাহ থাকতে হবে, যিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান, যার সকল আদেশ কার্যকর হবে, তার আদেশ বাতিল করা বা প্রতিহত করার মতো কেউ থাকবে না। তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীও থাকবে না এবং থাকবে না কোনো শরিক। আর তিনিই হলেন আল্লাহ। তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সঙ্গে কোনো মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের ওপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা শরিক করে, তিনি শরিক থেকে ঊর্ধ্বে।[২৬৪]

ঊর্ধ্বজগৎ ও নিম্নজগৎ তথা আসমান ও জমিন এবং এ দুইয়ের মাঝের সকলকিছুর ভারসাম্য, সৃষ্টির পর থেকে এগুলো সুশৃঙ্খলভাবে একটি নিয়মের মধ্যে চলছে, যার কোনো ব্যতিক্রম নেই, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ.

তুমি করুণাময় আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিতে কোনো তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও, কোনো ফাটল দেখতে পাও কি?[২৬৫]

মহাবিশ্বের নিখুঁত সৃষ্টি এবং তার সুশৃঙ্খল পরিচালনা কি প্রমাণ করে না যে, এর একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন? এগুলোকে একজন দক্ষ পরিচালক পরিচালনা করছেন? হ্যাঁ, এই সৃষ্টি ও তার নিখুঁত পরিচালনার মধ্যেই প্রমাণ রয়েছে, এর সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক এক এবং তার কোনো শরিক নেই। সুতরাং একমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে এবং তার নিকটই সাহায্যপ্রার্থনা করতে হবে। আর তিনিই হলেন আল্লাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই এবং অন্য কোনো ইলাহ নেই।

---

২৬৪ সুরা মুমিনুন, ৯১-৯২।
২৬৫ সুরা মুলক, ৩।

দ্বিতীয় আলোচনা—
আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্য দুর্বল ও ব্যর্থ :

সকল জ্ঞানী এই বিষয়ে একমত যে, আল্লাহর পরিবর্তে আর যাদের ইবাদত করা হয় তারা সব দিক থেকেই দুর্বল ও ব্যর্থ, তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ। এ সকল মিথ্যা মাবুদ না নিজের জন্য কোনোকিছু করার ক্ষমতা রাখে, না অন্যের জন্য। তারা কারও কোনো ক্ষতিও করতে পারে না, কোনো উপকারও করতে পারে না। তারা না কাউকে জীবনদান করতে পারে, না কারও মৃত্যু ঘটাতে পারে। কাউকে কিছু দেওয়া, বা নেওয়া, কাউকে সম্মানিত করা বা লাঞ্ছিত করা, কাউকে উঁচু করা বা নিচু করার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। প্রভু বা ইলাহের গুণসমূহের মধ্য থেকে তাদের কোনো গুণই নেই, তাহলে তাদের ইবাদত করা হবে কীভাবে?

সুতরাং যার অবস্থা হলো এই, তাকে কেন ভয় করতে হবে? তার নিকট কেন কোনোকিছু চাইতে হবে, আশা করতে হবে? তার নিকট প্রার্থনাই-বা করা হবে কেন? যে শোনে না, দেখে না এবং কিছুই জানে না তার নিকট কেন চাওয়া হবে?

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে এ সকল বাতিল ইলাহের দুর্বলতা ও ব্যর্থতাকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করো, যে তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ সব শোনেন ও জানেন।[২৬৬]

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.

তারা কি এমন কাউকে শরিক সাব্যস্ত করে, যে একটি বস্তু সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা, না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে। তোমরা যদি তাদেরকে আহ্বান করো সুপথের দিকে, তবে তারা তোমাদের আহ্বান অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহ্বান জানানো কিংবা নীরব থাকা উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা সবাই তোমাদের মতোই বান্দা। অতএব, তোমরা যাদেরকে ডাকো, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাক কবুল করা উচিত যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো? তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলাফেরা করে, তাদের কি হাত আছে, যা দিয়ে তারা ধরে, অথবা তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখতে পায়, তাদের কি কান আছে যা দিয়ে তারা শুনতে পায়?

---

২৬৬ সুরা মায়িদা, ৭৬।

বলে দাও, তোমরা ডাকো তোমাদের অংশীদারদেরকে, অতঃপর আমার অমঙ্গল করো এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না। আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। আর তোমরা তাকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকো তারা না তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে, না নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবে। আর তুমি যদি তাদেরকে সুপথে আহ্বান করো, তবে তারা তা কিছুই শুনবে না। আর তুমি তো তাদের দেখছই, তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।[২৬৭]

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا.

তারা তার পরিবর্তে কতক উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না। তারা নিজেরাই তো সৃষ্ট, তারা নিজেদের ভালোও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না। জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়।[২৬৮]

সঙ্গে সঙ্গে এ সকল মিথ্যা প্রভুরা তাদের পূজারিদের থেকে কোনো ক্ষতি বা অনিষ্ট দূর করতে পারে না। আল্লাহ এ কথাই কুরআনে বলেন—

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا.

বলুন, আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে করো, তাদেরকে আহ্বান করো। অথচ তারা তো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না।[২৬৯]

আর এটা তো জানা কথা, মুশরিকরা যে-সকল নবী-রাসুল, অলি-আওলিয়া, ফিরিশতা বা নেককার জিনদের ইবাদত করে, তারা নিজেরাই আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে তার ইবাদত-বন্দেগিতে ব্যস্ত থাকে এবং

---

২৬৭ সুরা আরাফ, ১৯১-১৯৮।
২৬৮ সুরা ফুরকান, ৩।
২৬৯ সুরা বনি ইসরাইল, ৫৬।

আল্লাহর আজাবের ভয়ে নত হয়ে তার অনুকম্পা ভিক্ষা করে। যাদের অবস্থা এমন, তাদেরকে প্রভু মনে করে ইবাদত করা কতই-না অবান্তর। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.

যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্যলাভের জন্য মাধ্যম তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তার রহমতের আশা করে এবং তার শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ।[২৭০]

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআনে কারিমে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তার পরিবর্তে আর যাদের ইবাদত করা হয়, তাদের মধ্যে ব্যর্থতা ও অপারগতার গুণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। কারও ডাকে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। আসমান জমিনের সামান্য থেকে সামান্য পরিমাণ মালিকানাও তাদের নেই। আল্লাহ তাআলা তার রাজত্ব সৃষ্টি এবং তা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের থেকে সামান্য পরিমাণ সাহায্যও নেননি। তারা তো কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলার সামনে শাফাআত করারও ক্ষমতা রাখবে না। কারণ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কিয়ামতের দিন কেউ শাফাআত করতে পারবে না। ইরশাদ হয়েছে—

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ.

বলুন, তোমরা তাদেরকে আহ্বান করো, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অণু পরিমাণ কোনোকিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। যার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, তার জন্য ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।[২৭১]

---

২৭০ সুরা বনি ইসরাইল, ৫৭।
২৭১ সুরা সাবা, ২২-২৩।

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.

তিনি আল্লাহ; তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তারই। তার পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শোনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত, আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।[২৭২]

---

২৭২ সুরা ফাতির, ১৩-১৪।

তৃতীয় আলোচনা—
উপমা দ্বারা বোঝানো :

উপমা পেশ করার মাধ্যমে মানুষকে কোনো একটি বিষয় খুব তাড়াতাড়ি ও অত্যন্ত সহজভাবে বোঝানো যায়। কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা প্রতিমাপূজারি এবং কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ এবং অন্য ইলাহদের বাতিল ও মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য বিভিন্ন উপমা পেশ করেছেন। কুরআনে এমন আয়াতের সংখ্যা অনেক। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সবগুলো উল্লেখ করছি না। বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা এখানে তিনটি উপমা নিয়ে আসছি।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

হে লোকসকল, একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করো, তারা কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনোকিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা সে মাছির কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই

শক্তিহীন। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, মহাপরাক্রমশীল।[২৭৩]

প্রত্যেক মানুষের চমৎকার এই উপমাটি শোনা দরকার, পড়া দরকার এবং ভালো করে চিন্তাভাবনা করা দরকার। এই একটিমাত্র আয়াতই মানুষের অন্তর থেকে শিরকের অন্ধকার দূর করে তাওহীদের আলো জ্বালাতে পারে।

দেখুন, আল্লাহ তাআলা কত সুন্দর উপমার মাধ্যমে বাতিল ইলাহদের বিষয়টি বুঝিয়েছেন। আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করা হয় তারা তো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। এমনকি তারা সকলেও যদি একত্র হয়, তবুও তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। মাছির মতো ছোট্ট একটি জিনিসই যদি সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে এর চেয়ে বড় জিনিস কীভাবে সৃষ্টি করবে তারা? শুধু তাই নয়, মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তারা সেটাকেও উদ্ধার করতে সক্ষম নয়। মাছি হলো অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষুদ্র একটা প্রাণী। তারা এই মাছি সৃষ্টি করা বা তার ছিনিয়ে নেওয়া জিনিসই উদ্ধার করতে সক্ষম নয়। তাহলে এ সকল ইলাহের চেয়ে দুর্বল ও ব্যর্থ কিছু আছে কি? কতই-না দুর্বল এবং কতই-না ব্যর্থ তারা। সামান্য বুদ্ধিও যার আছে সে কি আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে এমন ইলাহদের ইবাদত করতে পারে?

মুশরিকরা যাদের শরিক করে, সে সকল উপাস্যকে মিথ্যা ও বাতিল প্রমাণিত করতে কুরআনে কারিমে চমৎকার আরেকটি উপমা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.

যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে, তাদের উপমা হচ্ছে মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘর অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত। তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা-কিছুকে ডাকে, আল্লাহ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী,

---

২৭৩ সুরা হজ, ৭৩-৭৪।

প্রজ্ঞাময়। এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দিই, কিন্তু জ্ঞানীরাই কেবল তা বোঝে।[২৭৪]

এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ওই সকল লোকদের উপমা পেশ করেছেন, যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য ইলাহদের ইবাদত করে। আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, তারা অত্যন্ত দুর্বল। আর যারা তাদেরকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে তারা আরও দুর্বল। দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের কাছ থেকে যা আশা করে তা আরও দুর্বল, ঠিক যেমন মাকড়সা। মাকড়সা দুর্বলতম প্রাণীদের একটি। সে যে ঘর নির্মাণ করে তা ঘরসমূহের মধ্যে অন্যতম দুর্বল ঘর। সে ঘর যত বড় হতে থাকে, তত দুর্বল হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর পরিবর্তে তারা যে-সকল ইলাহ গ্রহণ করে তা অত্যন্ত দুর্বল। সুতরাং তারা যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে ডাকে, তাদের উদ্দেশ্য শক্তিশালী হওয়ার পরিবর্তে তা আরও দুর্বল হতে থাকে।[২৭৫]

মুশরিকরা যাদের শরিক করে, সে সকল উপাস্যকে মিথ্যা ও বাতিল প্রমাণিত করতে আরও একটি চমৎকার উপমা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, এক লোকের ওপর পরস্পরবিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে এবং অন্য আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন। তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।[২৭৬]

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাওহীদবাদী মুমিন এবং শিরককারী মুশরিকের উপমা দিয়েছেন। মুশরিকদের ভিন্ন ভিন্ন অনেক ইলাহের উপাসনার বিষয়টির উপমা হলো দুশ্চরিত্র, ঝগড়াটে এবং পরস্পরের মাঝে বিভেদ ও শত্রুভাবাপন্ন অনেকগুলো মালিকের অধীনে একজন দাসের মতো। যারা সকলেই তার থেকে খেদমত নেওয়ার জন্য বাড়াবাড়ি করতে থাকে। তার

---

২৭৪ সুরা আনকাবুত, ৪১-৪৩।
২৭৫ তাফসিরে বাগাবি, ৩/৪৬৮।
২৭৬ সুরা যুমার, ২৯।

পক্ষে তাদের সকলকে একসঙ্গে সন্তুষ্ট করা সম্ভব না। ফলে সে বেশ যন্ত্রণার মধ্যে থাকে।

আর তাওহীদবাদী মুমিন যখন এক আল্লাহর ইবাদত করে তার সঙ্গে কাউকে শরিক না করে, তার উপমা হলো মাত্র একজন লোকের অধীনে থাকা এক দাসের মতো। যে তার মালিকের সকল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি জানে এবং জানে তাকে সন্তুষ্ট করার পন্থা। সে তার নিজেকে সঁপে দিয়েছে তার মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য। ফলে সে বেশ শান্তিতে থাকে। মালিকের আনুগত্য করার কারণে তার দয়া ও করুণা পাবে। সুতরাং এই দুই দাস কি কখনো সমান হতে পারে? না, কখনোই তারা সমান হতে পারে না।[২৭৭]

২৭৭ তাফসিরে বাগাবি, ৪/৭৮।

চতুর্থ আলোচনা—
আল্লাহ তাআলা একমাত্র সকল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত :

পূর্বের আলোচনাগুলো থেকে আমরা মিথ্যা প্রভুদের বর্ণনা পেয়েছি যে, তারা নিজেদেরও কোনো উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং অন্যেরও কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তাদের নেই। সুতরাং তারা ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত নয়। বরং ইবাদতের উপযুক্ত তো একমাত্র তিনিই, যিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান, যিনি সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত, যিনি দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক, উপকার বা ক্ষতি এবং দেওয়া বা না দেওয়া যার অধিকারে, একমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে। সর্বদা তার জিকির করতে হবে। কখনোই তাকে ভুলে থাকা যাবে না। তার শুকরিয়া আদায় করতে হবে। তার আনুগত্য করতে হবে, অবাধ্য হওয়া যাবে না এবং তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা হলেন কামালে মুতলাক তথা সর্বদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ কামালে মুতলাক নয়, সকলেই নাকেসে মুতলাক তথা অসম্পূর্ণ। আল্লাহ তাআলার কামালে মুতলাক হওয়ার বিষয়টি নিম্নের কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে পেশ করছি।

ক. আল্লাহ তাআলা একমাত্র ইলাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, তার কোনো মৃত্যু নেই। তিনি অবিনশ্বর, নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল, সকল মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী এবং সকল মাখলুক সব দিক থেকে তার মুখাপেক্ষী। তার চিরঞ্জীবতা ও অবিনশ্বরতার একটা দিক হলো,

তার কখনো ঘুম বা তন্দ্রা আসে না। আসমান ও জমিনের মধ্যে যা-কিছু আছে তার সকলকিছুই তার অধীনস্থ। ইরশাদ হয়েছে—

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا.

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তার কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন।[২৭৮]

আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও প্রতাপের সামনে কেউ মাথা তুলে তাকাতে পারবে না। তার অনুমতি ব্যতীত কেউ শাফাআত করতে পারবে না। প্রত্যেক শাফাআতকারীই তার বান্দা ও গোলাম। অনুমতি দেওয়ার আগে তারা শাফাআত করার জন্য এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকেই শাফাআতের অনুমতি দেবেন, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাআলার ইলমে রয়েছে সমস্ত সৃষ্টিজগৎ। গোপন-প্রকাশ্য কোনোকিছুই তার ইলমের বাইরে নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে যতটুকু জানান, মানুষ কেবল ততটুকুই জানতে পারে। এর বাইরে মানুষের কোনো জ্ঞান নেই। আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের একটি দিক হলো, তার কুরসি আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মধ্যে যা-কিছু আছে, সকলকিছুর স্রষ্টা এবং হিফাজতকারী তিনি। সৃষ্টি করা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ আল্লাহ তাআলার জন্য কঠিন কিছু নয়। বরং তা আল্লাহ তাআলার জন্য অত্যন্ত সহজ। তিনি মহান, সকল জিনিসের উর্ধ্বে। ইরশাদ হয়েছে—

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

---

২৭৮ সুরা মারয়াম, ৯৩-৯৪।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা-কিছু রয়েছে, সবই তার। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তার কাছে তার অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা-কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। তার জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনোকিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তার সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তার পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।[২৭৯]

খ. তিনি এমন ইলাহ যার বড়ত্ব ও প্রতাপের সামনে সকলকিছুই নত ও অনুগত। প্রাণী, জড়পদার্থ, মানুষ, জিন ও ফিরিশতাসহ সকলকিছুই তার অনুগত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.

তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও জমিনে যা-কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তারই অনুগত হবে এবং তার দিকেই ফিরে যাবে।[২৮০]

গ. কারও ক্ষতি বা উপকার করা একমাত্র তার নিয়ন্ত্রণে। পৃথিবীর সকল মাখলুকও যদি কারও উপকার করার জন্য একত্রিত হয়, তবে তারা কোনো উপকার করতে পারবে না, আল্লাহ তাআলা তার জন্য যতটুকু লিখে রেখেছেন ততটুকু ব্যতীত। আবার পৃথিবীর সকলে মিলেও কারও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ তাআলা যতটুকু লিখে রেখেছেন ততটুকু ব্যতীত। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা না করলে কেউ কারও কোনো উপকার করতে পারবে না, কারও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

---

২৭৯ সুরা বাকারা, ২৫৫।
২৮০ সুরা আলে ইমরান, ৮৩।

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

আল্লাহ যদি তোমার ওপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত কেউ তা দূর করতে পারবে না। পক্ষান্তরে তিনি যদি কল্যাণদান করেন, তবে কেউ তা ফেরাতে পারবে না। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন। বস্তুত, তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু।[২৮১]

ঘ. তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান, যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই তিনি ব্যর্থ নন এবং কোনোকিছুই তাকে ব্যর্থ করতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ.

তিনি যখন কোনোকিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও,' তখনই তা হয়ে যায়।[২৮২]

ঙ. তার ইলম সকল বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। তিনি বর্তমান যেমন জানেন, তেমনই জানেন গায়েব। যা হয়েছে, যা হবে এবং যেভাবে হবে তিনি তার সবকিছুই জানেন। ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

আল্লাহর নিকট আসমান ও জমিনের কোনো বিষয়ই গোপন নেই।[২৮৩]

وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.

---

২৮১ সুরা ইউনুস, ১০৭।
২৮২ সুরা ইয়াসিন, ৮২।
২৮৩ সুরা আলে ইমরান, ৫।

আর তোমার প্রভু থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও, না জমিনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোনোকিছু আছে, না বড় যা এই সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।[২৮৪]

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.

তার কাছেই অদৃশ্যজগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। তার অজান্তে কোনো পাতা পর্যন্ত ঝরে না। কোনো শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোনো আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না, কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে।[২৮৫]

যারা আল্লাহ তাআলার এ সকল গুণের কথা এবং এ ছাড়াও তার অন্য সকল সিফাতে কামালের কথা জানবে, তারা অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, তার ইবাদত করবে। আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করবে না। কেননা, ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

---

২৮৪ সুরা ইউনুস, ৬১।
২৮৫ সুরা আনআম, ৫৯।

পঞ্চম আলোচনা—
বৈধ ও অবৈধ শাফাআত :

শাফাআত (الشفاعة) আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ সুপারিশ করা। পরিভাষায় বলা হয়, অন্যের জন্য কোনো কল্যাণ অর্জন অথবা অকল্যাণ বর্জনের মাধ্যম হওয়া।

যারা শাফাআতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারও ইবাদত করে বা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অন্যকে শরিক করে, তাদের জানা থাকা দরকার যে, শাফাআত একমাত্র আল্লাহ তাআলার অধীনে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে শাফাআতের অধিকার দেবেন। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

> বলুন, সমস্ত শাফাআত আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, আসমান ও জমিনে তারই সাম্রাজ্য। অতঃপর তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[২৮৬]

আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে শাফাআতকারী মনে করা শিরক। এটি যৌক্তিকভাবেও গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি প্রমাণের জন্য নিম্নে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি।

এক. সৃষ্টি কখনো স্রষ্টার মতো নয়। যারা বলে, নবী-রাসুল, অলি-আওলিয়া এবং ফিরিশতাগণ আল্লাহ তাআলার নিকট মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ তাআলার নিকট তাদের একটা অবস্থান রয়েছে। সুতরাং তারা আমাদের জন্য শাফাআত

২৮৬ সুরা যুমার, ৪৪।

করবে, ঠিক যেমন দুনিয়ার রাজাবাদশাদের নিকট সভাসদবর্গ এবং এমপি-মন্ত্রীদের একটা অবস্থান থাকে। আর রাজাবাদশাদের পর্যন্ত পৌছতে হলে এবং তাদের থেকে কোনো প্রয়োজন মেটাতে চাইলে অবশ্যই এমপি-মন্ত্রী বা কাছের কাউকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হয়, তাদের সুপারিশ ব্যতীত তার নিকট পৌছা যায় না।

এমন যুক্তি ঠিক নয়, বরং এটা একটা অযৌক্তিক যুক্তি। কারণ তারা আল্লাহ তাআলাকে দুনিয়ার নাকেস রাজাবাদশাদের সঙ্গে তুলনা করছে, যারা কিনা তাদের উজির-নাজির বা এমপি-মন্ত্রী ব্যতীত রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। যারা তাদের শক্তি ও শাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এ সকল এমপি-মন্ত্রীর মুখাপেক্ষী, তাদের ব্যতীত তারা সম্পূর্ণ অচল। তিন কারণে উজির-নাজির এবং এমপি-মন্ত্রীরা রাজাবাদশাদের মাধ্যম হয়ে থাকে।

ক. তাদের মাধ্যমে রাজাবাদশাগণ জনগণের খোঁজখবর নিয়ে থাকে।

খ. তারা একাকী রাজ্যপরিচালনা করতে সক্ষম নয়, তাই তাদের সাহায্যের শরণাপন্ন হয়ে থাকে।

গ. রাজা নিজে তার প্রজাদের কোনো খোঁজখবর রাখে না, বরং সে তার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, এমপি-মন্ত্রীদের থেকে কেউ কোনো বিষয়ে সুপারিশ করলে সেটা সে পূরণ করে।

কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা এমন নন। তিনি দুনিয়ার এ সকল নাকেস রাজাবাদশার মতো নন। তিনি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করেন। তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কেউ নেই। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয় জানেন। যা ঘটেছে তাও তিনি জানেন এবং ভাবীকালে যা ঘটবে তাও জানেন। কোনোকিছুই তার ইলমের বাইরে নেই। তিনি বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। সন্তানের প্রতি মায়ের দয়ার চেয়েও বান্দার প্রতি তার দয়া বেশী।

আর এটি তো জানা কথা যে, দুনিয়ার রাজাবাদশাদের নিকট সুপারিশকারী এমপি-মন্ত্রীদের আলাদা একটা ক্ষমতা আছে। রাজত্বের ক্ষেত্রে তাদেরও অংশীদার বা শরিকানা আছে। কারণ রাজত্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা তাদের সহযোগী। আর রাজাবাদশারাও তাদের শাফাআত বা সুপারিশ গ্রহণ করে তিন কারণের কোনো এক কারণে।

ক. কখনো কখনো তারা তাদের মুখাপেক্ষী তাই।

খ. কখনো কখনো তারা তাদের ভয় করে।

গ. কখনো কখনো রাজাদের প্রতি এমপি-মন্ত্রীদের প্রতিদানের বদলা দেওয়ার জন্য।

মানুষ সাধারণত এ সকল কারণেই সুপারিশ করে বা গ্রহণ করে। সুতরাং আশা বা ভয় ব্যতীত কেউ কারও সুপারিশ গ্রহণ করে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমন নন। তিনি কোনো ক্ষেত্রেই কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে ভয়ও করেন না এবং কারও নিকট তার আশা করা বা পাওয়ারও কিছু নেই। তাই তিনি কারও সুপারিশ গ্রহণ করতে বাধ্য নন। বরং তার অনুমতি ব্যতীত তার নিকট শাফাআত বা সুপারিশ করার অধিকার কারও নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.

বলুন, তোমরা তাদেরকে আহ্বান করো, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অণু পরিমাণ কোনোকিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। যার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, তার জন্য ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। যখন তাদের মন থেকে ভয়ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের পালনকর্তা কী বললেন? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনিই সবার ওপরে মহান।[২৮৭]

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের সামনে থেকে শিরকের দিকে যাওয়ার সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছেন অর্থাৎ অবৈধ বা হারাম করে দিয়েছেন।

শাফাআত দুই প্রকার। ক. গ্রহণযোগ্য শাফাআত। খ. অগ্রহণযোগ্য শাফাআত।

---

২৮৭ সুরা সাবা, ২২-২৩।

❖ গ্রহণযোগ্য শাফাআত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিকট শাফাআত করা। গ্রহণযোগ্য শাফাআতের দুটি শর্ত রয়েছে।

ক. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাফাআতকারীকে শাফাআতের অনুমতি প্রদান করা। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

কে আছ এমন যে সুপারিশ করবে তার কাছে তার অনুমতি ছাড়া?[২৮৮]

খ. শাফাআতকারী এবং যার জন্য শাফাআত করা হবে তাদের উভয়ের প্রতিই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি থাকতে হবে। ইরশাদ হয়েছে—

لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ.

তারা শুধু তাদের জন্য সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর ভয়ে ভীত।[২৮৯]

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.

দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন, সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোনো উপকারে আসবে না।[২৯০]

❖ অগ্রহণযোগ্য শাফাআত হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও নিকট শাফাআত কামনা করা, আল্লাহ তাআলার অনুমতি বা সন্তুষ্টি ব্যতীত শাফাআত এবং কাফিরদের জন্য শাফাআত। ইরশাদ হয়েছে—

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.

অতএব, সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না।[২৯১]

শাফাআতের আশায় আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারও পূজা করা বা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক বাতিল। কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা তা

---

২৮৮ সুরা বাকারা, ২৫৫।
২৮৯ সুরা আম্বিয়া, ২৮।
২৯০ সুরা তাহা, ১০৯।
২৯১ সুরা মুদ্দাসসির, ৪৮।

প্রমাণিত। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তার পূর্বের কোনো নবী শাফাআতের উদ্দেশ্যে কোনো ফিরিশতা, কোনো নবী বা অলি-আওলিয়ার নিকট প্রার্থনা করতে বলেননি। কোনো সাহাবি, তাবেয়ি কিংবা তাবে-তাবেয়িও এমনটি করেননি। প্রসিদ্ধ চার ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ি, আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম মালেক রহিমাহুমুল্লাহ এবং এমনকি অন্য কোনো ইমাম বা মুজতাহিদ আলিমও এটা বলেননি।

ষষ্ঠ আলোচনা—
আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সকলকিছু মানুষের অনুগত বানিয়েছেন :

মুশরিকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বানের একটি হিকমতপূর্ণ দিক হলো প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, দ্বীনি ও দুনিয়াবি আল্লাহর বড় বড় নিয়ামতের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বান্দা যত নিয়ামত ভোগ করছে তা আল্লাহই তাকে দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ.

তোমাদের কাছে যে-সমস্ত নিয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে।[২৯২]

আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য এই পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তার সবকিছুই বশীভূত করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে বান্দার ওপর এ সকল নিয়ামত দান করেছেন। সুতরাং তিনিই একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত। বান্দার ওপর আল্লাহর নিয়ামতের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا.

---

২৯২ সুরা নাহল, ৫৩।

তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জমিনে যা-কিছু রয়েছে তার সব।[২৯৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً.

তোমরা কি দেখো না আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা-কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন?[২৯৪]

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

এবং আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমণ্ডলে ও যা আছে ভূমণ্ডলে; তার পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।[২৯৫]

এখানে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, অনুভূতিযোগ্য ও আধ্যাত্মিক সকলপ্রকার নিয়ামতের কথা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং আসমান ও জমিনে যা-কিছু আছে তার সবকিছুই আল্লাহ তাআলা মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। এই নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত আসমান ও জমিনে যা-কিছু আছে সব। যেমন চাঁদ, সূর্য, গ্রহনক্ষত্র, মহাশূন্য, পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী. সকলপ্রকার প্রাণী, সব ধরনের গাছপালা, ফুল-ফল এবং সকল প্রকারের খনিজ সম্পদসহ পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তার সবকিছুই মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হবে, উপভোগ করবে এবং এসব থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে।

---

২৯৩ সুরা বাকারা, ২৯।
২৯৪ সুরা লুকমান, ২০।
২৯৫ সুরা জাসিয়া, ১৩।

এ সবকিছু প্রমাণ করে আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই। একমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে, তার সামনেই মাথানত করতে হবে, একমাত্র তাকে ও তার জন্যই ভালোবাসতে হবে। এটা হলো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ। এরপর আল্লাহর ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আল্লাহর পরিবর্তে অন্য যাদের ডাকা হয়, বা ইবাদত করা হয় তারা সকলে বাতিল ও মিথ্যা। ইরশাদ হয়েছে—

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.

এটা এ কারণে যে, আল্লাহই সত্য; আর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য। আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান।[২৯৬]

নিয়ামতের বর্ণনাসংবলিত আরও দুটি আয়াত :

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.

এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে। সর্বদা এক নিয়মে রাত ও দিনকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে-সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।[২৯৭]

وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن

২৯৬ সুরা হজ, ৬২।
২৯৭ সুরা ইবরাহিম, ৩৩-৩৪।

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.

তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পারো এবং তা থেকে বের করতে পারো পরিধেয় অলংকার। তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ করো এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার করো। তিনি পৃথিবীর ওপর বোঝা রেখেছেন, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলেদুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরি করেছেন, যাতে তোমরা পথপ্রদর্শিত হও। তিনি পথনির্ণায়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, তারকা দ্বারাও মানুষ পথের নির্দেশ পায়। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করবে না? যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।[২৯৮]

যে স্রষ্টা এ সকল নিয়ামত এবং এই আশ্চর্য সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তিনি ওই ব্যক্তির মতো, যে কিছুই সৃষ্টি করেনি? বান্দার একটিমাত্র অঙ্গের মাঝে আল্লাহ তাআলা যে-সকল নিয়ামত দিয়েছেন, তা গণনা করে শেষ করা কোনো বান্দার পক্ষে সম্ভব না। তাহলে তার সমস্ত শরীরে যে নিয়ামত দিয়েছেন, তা সে গণনা করে শেষ করবে কীভাবে। এরপর প্রতিটি মুহূর্তে তার ওপর আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যে নিয়ামতগুলো বর্ষিত হচ্ছে, তা গণনা করা কি কারও পক্ষে সম্ভব? মানুষের জ্ঞান বিকল হয়ে যাবে, কিন্তু তার ওপর আল্লাহ তাআলার নিয়ামতরাজি গণনা করে শেষ করা যাবে না। এ বিষয়গুলো অনুধাবন করার পরও কি কোনো বান্দা এক আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারও ইবাদত করবে? আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করবে? কোনো সুস্থ ও বিবেকবান কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

---

২৯৮ সুরা নাহল, ১৪-১৮।

হে আল্লাহ! আপনি এক ও অদ্বিতীয়। আপনি মহান, আপনার কোনো শরিক নেই।

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং
আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আল্লাহর বান্দা ও তার রাসুল।

وصلي الله و سلم و بارك علي عبده و رسوله محمد بن عبد الله و علي آله و
أصحابه و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين.

তাওহীদের পাঠশালা শীর্ষক গ্রন্থটি আরবের বিশিষ্ট আলিম ও সাড়া জাগানো লেখক ডক্টর সাইদ ইবনে আলি আল-কাহতানি রচিত আল-উরওয়াতুল উসকা গ্রন্থের অনুবাদ। বাংলাভাষী পাঠকদের কথা ভেবে বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা এ সহজ নামটি চয়ন করেছি। পুরো গ্রন্থে কুরআন ও হাদিসের আলোকে ঈমানের পরিচয়, ঈমানের মাহাত্ম্য, ঈমানে দাবি, ঈমানের শর্ত, ঈমানের রুকন, ঈমান দুর্বল ও ভঙ্গের কারণ নাতিদীর্ঘ পরিসরে লেখক আলোচনা করেছেন। দীর্ঘ কলেবর নয় যে পাঠক বিরক্ত হবেন, আবার অতি সংক্ষিপ্ত নয় যে বোধগম্য হবে না।